# তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

# অসামান্য

## বার্ষিক কলেজ পত্রিকা

২০১৬-১৭

# Gallery

Olivia Mondal
English (Hons.)
1st Year.

Bristi Biswas

Jagashri Karmakar
Bengali (Hons.) 2nd Year

# কলেজ পত্রিকা

## প্রথম সংকলন ২০১৬ - ১৭

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদীয়া

# কলেজ পত্রিকা

প্রথম সংকলন ২০১৬ -১৭

প্রকাশক ঃ-
ডঃ গোবর্দ্ধন রানো

সত্ত্বাধিকারী ঃ-
ডঃ গোবর্দ্ধন রানো

প্রকাশকাল ঃ-
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

প্রচ্ছদ ঃ-
Anna Rosa Pelayo Velasco

অলংকরণ ঃ-
ডঃ শিবশংকর পাল

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ-
অনির্বাণ দাস

সম্পাদক ঃ-
সাইদুল হক
নীতীশ ঘোষ

## সূচিপত্র


সম্পাদকীয় ১
শুভেচ্ছাপত্র ২

গদ্য

Economic Vision of Netaji Subhas Bose ৩
অরিত্র মজুমদার

গৌতম বুদ্ধের দর্শন ভাবনা ৭
নাজির হসেন

'ব্যক্তি'-গত ৯
প্রীতিন দত্ত

বৈবাহিকের দপ্তর ১১

বৃহন্নলা বনাম সমাজ ১৭
সুস্মিতা ঘোষ

মুসৌরির জঙ্গলে ১৯
সামিদুল সেখ

কঠোর আইন করে কী হবে? ২২
কৃষ্ণকান্তি হালদার

নোটের জ্বালা ২৫
সোমনাথ প্রামাণিক

ইতি গোমস্ হত্যা রহস্য ২৭
বনানী বিশ্বাস

গোপীনাথপুর কুলাই তলা মেলার বিষয়বস্তু ৩০
পিযুস হালদার

ত্রিহট্টের কৃষ্ণরায় ৩২
মৌমিতা বিশ্বাস

## পদ্য

কবিতা কার্নিভাল ৩৬
উপস্থনায় - শিবশংকর পাল

নুন ৩৮
সুপ্রতিম মুখার্জ্জী

বিষকন্যা ৩৮
সৌমি মাঝি

The Spring ৩৯
Nilanjan Biswas

The Devotion ৩৯
Somashree

তুমি চলে গেছো অনেক দূরে ৪০
অক্ষয় বিশ্বাস

আমার কলেজ ৪০
দীপা মিস্ত্রী

প্রকৃতির রূপ ৪১
মৌমিতা হালদার

আমার গ্রাম ৪১
অনিন্দিতা বিশ্বাস

স্বপ্ন ৪২
কল্যান চন্দ্র পাল

বসন্তের রঙে ৪২
তিথি প্রামাণিক

তথ্য ৪৩

# সম্পাদকীয়

নদিয়া জেলার প্রান্তভূমিতে, জলঙ্গি নদীর তীরে তেহট্টের জনপদে সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে তেহট্ট গভর্নমেন্ট কলেজ। পঠন-পাঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে কলেজ তার যাত্রাপথ শুরু করেছে। যার লক্ষ্যমুখী পরিনাম বনস্পতির বেড়ে ওঠা কিংবা জীবদেহের পরিনতির মতো। আর তার-ই আনুষাঙ্গিক উপাদান কলেজ পত্রিকা। যা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার অন্যতম দর্পনরূপে সর্বজন স্বীকৃত। এই মানদন্ডকে শীরোধার্য করে প্রকাশিত হলো তেহট্ট গভর্নমেন্ট কলেজের প্রথম বার্ষিক পত্রিকা 'ধনধান্য'।

আমাদের এই পত্রিকায় অধিকাংশ সাহিত্য প্রকরণকেই সুচারুরূপে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণই একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। যার প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ সম্পাদকদ্বয় বহু রচনাকে মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাদ দিতে অক্ষম হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কলেজের প্রতিটি অধ্যাপক তাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। রচনা নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট হলে তার দায় সম্পাদকদ্বয়ের।

কলেজের এই পত্রিকা প্রকাশে যার নাম করাটা আনুষ্ঠানিকতার নামান্তর বা বড় বেশি পোশাকি হয়ে উঠবে, আবার নাম না করাটাও কৃতঘ্নতার সামিল; তিনি হলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শিবশংকর পাল মহাশয়। কারণ পত্রিকার নামকরণ, অলংকরণ — মোটকথা পত্রিকার গর্ভযন্ত্রনা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত সহ্য করেছেন শিক্ষানবিশ সম্পাদকদ্বয়ের অত্যাচার।

শিল্পসাধনা যাঁর জীবনের প্যাশান, ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবনের সমন্বয় সাধন যাঁর শিল্পকর্মের মূলসুর — একালের সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Anna Rosa Pelayo Velasco তাঁর অন্যতম সেরা 'Unfolding Time' চিত্রটিকে আমাদের পত্রিকার প্রচ্ছদপটের অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ গোবর্দ্ধন রানো মহাশয়। পত্রিকার প্রুফ সংশোধনে ও পান্ডুলিপির সমস্ত রচনা সাগ্রহে পড়ে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুপ্রতীম মুখার্জ্জী মহাশয়। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। এর সম্পূর্ণ দায়ভার সম্পাদকদ্বয়ের।

ধন্যবাদান্তে—
সাইদুল হক
নীতীশ ঘোষ

# শুভেচ্ছা

"মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হল শিক্ষা" বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর জ্ঞানই কেবল মাত্র এই বিকাশে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। মানব জাতির চরম লক্ষ্যই হল জ্ঞান লাভ। সুখ বা দুঃখ নয়। কারণ সুখ এবং দুঃখ দুইই ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞান-ই চিরন্তন। ভারতীয় দর্শন বারবার এই কথাই বলে এসেছে। অতএব জ্ঞান লাভ না করলে শিক্ষিত হওয়া যায় না। আবার এই জ্ঞান বাহির হতে লাভ করাও সম্ভব নয়। আমাদের অন্তরই সকল জ্ঞানের ভান্ডার। সেখান থেকেই আমাদের তা লাভ করতে হবে। সুতরাং শিক্ষাও বাহির হতে লাভ করা যায় না। চকমকি পাথর ঠুকলে আগুন বের হয়। সেই আগুন কি বাইরে থেকে আসে? আগুন পাথরের ভিতর থেকেই আসে। শিক্ষাও তেমনি ভিতর থেকেই আসে। আমরা শিক্ষক মহাশয়রা কেবল পাথর ঠুকার কাজটা করতে পারি। তাও পরমেশ্বর ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিত নয়। যার ইচ্ছাই তেহট্ট গভর্নমেন্ট কলেজ জলঙ্গির নদী বাঁকে এই নির্জন শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে গড়ে উঠেছে তাঁরই ইচ্ছাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির গরিমা দিকে দিকে উদ্ভাসিত হোক। ভগবানের কাছে এটাই আমাদের প্রার্থনা।

ইতি
ডঃ গোবর্দ্ধন রানো
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

# Economic Vision of Netaji Subhas Bose

Aritra Majumdar
Assistant Professor in History

One of the first thoughts that come to mind when thinking about Subhas Chandra Bose is his contribution to the Indian national struggle. Rising to prominence from the mid 1920s, Bose would take an active role in all the major phases of the Gandhian freedom struggle before moving to Germany and Japan during WWII to carry on an armed struggle with the Azad Hind Fauj. What is perhaps less known about Netaji is that he had a keen mind for economic ideas, which he shaped into a clear economic outline of the future independent India. Though he did not survive to see the day India became independent, his ideas nevertheless had an impact during the 1930s upon the minds of Indian nationalists. To this end, his ideas are deserving of careful study.

Before looking at Bose's ideas, it would be pertinent to understand the broader economic space within which he existed. From the late 19th Century, Indians had increasingly become aware of the economic exploitation that their country was undergoing at the hands of the British. This exploitation was primarily the result of India being used as a vast hinterland for producing cheap raw materials and a vast market for sale of goods as varied as salt, cloth, metal implements and railway coaches. This process discriminated against the local industries of India, which gradually died out or became extremely localised.

This economic foundation of imperialism had been called out by the likes of Dadabhai Naoroji and RC Dutt. Being nationalists and members of the Indian National Congress, these men also realised that unless India could reverse this process and prevent wealth from being sucked out of the country, she would forever remain a poor hinterland for a rich metropolis. Means of achieving this reversal, presumably once the British were thrown out, were debated in the early 20th Century. One solution that was arrived at was the Gandhian one. Indians would go back to villages, which would produce everything needed. With only a few products being imported or exported, the village would provide all needs and become small nations in themselves.

Most thinkers however rejected Gandhi's ideas in favour of an industrialised future where India would rightly stake her claim to being the manufacturing powerhouse that she was as late as the 18th Century. In the 1930s, the advent of Five Year Plans in the USSR made Indians realise the importance of planned and centrally directed economic progress. Jawaharlal Nehru and Subhas Bose both subscribed to this ideal of a planned economic progression. It was Subhas Bose, however, who moved forward to take the first steps towards making this planned economy a reality.

Bose believed that the primary problems of India were poverty, illiteracy and disease. Speaking at the Haripura Congress in 1938, he believed that these could best be solved through focused scientific production and distribution. For this purpose, he argued that the future nationalist government of India would have, among its first tasks, the drawing up of an immediate and a longterm programme. For the immediate programme, Bose suggested the political and economic unification of India, preparation of the people for self-sacrifice and giving scope for social and cultural autonomy within the broader socio-economic sphere that would come into being. Regarding the first, Bose wisely noted that this would involve on one hand a common script and a common education policy, and on the other, a communications revolution involving airplanes, trains, etc.

It was the long-term programme, however, where Bose provided answers to what the economic picture would really look like. Unequivocally rejecting the Gandhian concept of a bullock cart economy, Bose argued that - "India is still in the pre-industrial stage of evolution. No industrial development is possible unless we first pass through the throes of an industrial revolution. Whether we like it or not, we have to reconcile ourselves to the fact that the present epoch is the industrial epoch in modern history. There is no escape from the industrial revolution. We can at best determine whether this revolution, that is industrialisation, will be a comparatively gradual one, as in Great Britain, or a forced march, as in Soviet Russia. I am afraid that it has to be a forced march."

Bose believed that India was far behind the industrialised powers, and world conditions did not provide her with the luxury of gradually industrialising. Instead, she would have to follow the example set by Soviet Russia, ie of rapid industrialisation. In a discussion with Meghnad Saha, he argued that for this purpose, the country would have to set up a National Planning Commission. This commission would draw up a plan, according to which the entire economic development of the country would take place. Of course, such development would be along industrial lines and proceed at a brisk pace. Such progress, Bose argued, would be necessary if the prime problem - poverty was to be solved. the Indian agricultural system could no longer provide the necessary sustenance needed by the countrymen, and a shift of labour from agriculture to industry was vitally important if the living standards of the people were to be improved. In other words, industrialisation would generate the necessary employment, which in turn would raise the Gross Domestic Produce (GDP) of the country.

Delving deeper into the characteristics of industrialisation, Bose explained that he was completely in favour of large-scale industrialisation. Such development, he believed, would be important simply because it would pave the way for production of greater number of cheaper goods through smaller as well as large industries. However, he believed that this need not be at the cost

of cottage industries. Cottage industries, producing small amounts of goods through the labour of the farmer's family, would coexist happily with large industries as the two would complement each other. Hence, Bose's vision of independent future was not that of a badly polluted industrial wasteland, but one where large and cottage industries would each contribute in their own way to improving the living conditions of the people.

Special emphasis was laid on the "mother industries" ie those which would provide the framework for other industries. These would include those that produced capital goods i.e.. implements and machines for other industries, power industries, chemical industries and so on. At a time when these were completely absent in India and even Indian rail coaches tended to be imported, such an argument correctly assumed that the costs of importing would be far more than of producing in India using the abundant mineral and labour reserves that India had. Of course, Bose did not simply believe industries would come out of thin air. For one, he argued for intensive surveys that would map every area for possible mineral, power, market and labour economies and recognise possible conflicts between large and cottage industries before such conflicts actually arose. Further, he believed that the Indians were lacking in technical education and skilled workmanship. Hence, to turn India's abundant but poorly skilled millions into efficient workers, he argued that the government should undertake intensive schemes of technical education. This brings to mind the contemporary "father of planning", M Visvesvaraya's argument that an industrial mentality had to be developed among the country's youth by means of linking the education system with factories and giving students a first-hand vision of what production processes looked like.

Last but not least, Bose was aware that agriculture would be vitally important even if it did not solve the problem of employment. To this end, he suggested a revolutionary change in land relations and distribution of land. This change would ensure that moderately large farms came into being. Here, farming would take place along scientific lines so that the maximum food could be produced for feeding the country's teeming millions.

These ideas, to be fair, were neither unique nor uncommon. Nehru had propounded similar ideas, as had Visvesvaraya. However, Bose had given them a concrete shape with perhaps none of the mainstream nationalist leaders of the time could. This is remarkable because at the time, there was very little that could inform Bose that India was barely a decade away from independence.

More importantly, Bose did not stop at theory. He sought to give these ideas concrete shape during his term as Congress president between 1938 and 1939. To begin with, he summoned an Industries Ministers' Conference at Bombay in 1938 to iron out a programme of industrial

development for the Congress-ruled ministries. This would pave the way, as it did, for a National Planning Committee. This Committee would, in turn, carry out surveys and studies and frame suggestions for what would become the Planning Commission. In fact, he was instrumental in persuading Jawaharlal Nehru to become the Chairman of the Planning Committee, and thus began Nehru's tryst with the planning process.

Unfortunately, the coming of the Second World War, India's entry into the war at Britain's direction, quitting of ministries by the Congress and the Quit India movement, together threw the Committee's work into utter disarray. Many leaders, including Nehru himself, were sent to jail. Bose himself sought to give leadership to an armed struggle against British forces and went to Europe for this purpose. He would never again return to India. In his absence, the Committee would reconvene after the War, and would publish its reports in 1948. These, and the ideas of Bose in general, would become the foundations for the Planning Commission, which would eventually be formed by Nehru in 1952.

In hindsight, it may be said that if Nehru was the father of planning in independent India, Bose had laid the seeds of the process by putting forth a clear and coherent scheme for India's economic development long before she could even dream a real planning commission. Hence, when the Planning Commission published *Subhas Chandra Bose Pioneer of Indian Planning,* 40 years after Bose's departure from India, it was acknowledging - very belatedly - the great contribution Netaji Subhas Chandra Bose had made to giving India's economy the shape took in the Nehruvian eraand after.

# গৌতম বুদ্ধের দর্শন ভাবনা

নাজির হসেন

প্রজ্ঞা, বীর্য, প্রেম ও ত্যাগের পরিপূর্ণ মূর্ত প্রতীক বুদ্ধদেব। আনুমানিক ৫৬৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলা বস্তুর শাক্যবংশের এক রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে ছিলেন। পিতা ছিলেন শুদ্ধোধন আর মাতা মায়াদেবী। গৌতম বুদ্ধের বাল্যকালের নীম ছিল সিদ্ধার্থ। সংসারে মানুষের রোগ, জরা ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তিনি বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এবং কিভাবে মানুষের দুঃখকে নিরাময় করা যাবে তার উপায় অনুসন্ধান শুরু করেন। অবশেষে শুধুমাত্র ২৭ বছর বযসে স্ত্রী যশোধার সান্বিধ্য ত্যাগ ও দিব্যকান্তি শিশুপুত্র রাহুলের গভীর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে সংসার ত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে তপস্যা করতে শুরু করেন এবং একটানা ৬ বছর তপস্যা করে ৩৫ বছর বয়সে বোধি বা প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন। এরপর থেকে তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী হিসাবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব পাহাড়ে কিংবা সমাজের বাইরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে আয়াস ভোগ করেন নি। তিনি লোক সমাজে ফিরে এসে বহু মঠ ও শ্রবণ সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এভাবে সর্বজীবের কল্যাণ সাধনায় আজীবন বোধিলব্ধ আর্যসত্য প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় ৪০০ বছর পরে তার বাণীকে আশ্রয় করে এক ধর্ম ও দর্শন গড়ে ওঠে। এই ধর্ম ও দর্শন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে ব্যাপক দ্রুত গতিতে প্রসারিত হতে থাকে।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন — "জগৎ বাসীর অশ্রুমোচনের জন্য প্রত্যেক মানুষের দুঃখের বোঝা যদি আমাকে বহন করতে হয় তাহলে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তা আমি বহন করবো।"

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সংসারে আবদ্ধ মানুষ দুঃখের সাগরে ডুবে আছে। এই দুঃখের সাগর থেকে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায় তার উপায় অনুসন্ধানই ছিল বুদ্ধদেবের মূলব্রত। তিনি মনে করেন, দুঃখে জর্জরিত মানুষের পক্ষে অলস নিরর্থক তত্ত্ব ( theory ) আলোচনায় মগ্ন রাখা একান্তই মুর্খতা। একথার তাৎপর্য বোঝার জন্য একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক — এই জগতে এমন কেউ আছে যে নিজের শরীরে বিদ্ধ বিষাক্ত তীর ( arrow) কে না ছাড়িয়ে চিন্তা করবে তীর কোথা থেকে এলো? কে তৈরী করেছে? কোথা থেকে ছোঁড়া হয়েছে? ইত্যাদি। মূল কথা, দুঃখের হাত থেকে কিভাবে চিরোকালীন মুক্তি লাভ করা যায়- এটাই মূল জিজ্ঞাসা।

বুদ্ধদেব মানুষকে সর্বদা দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ নিবৃতি ও দুঃখ নিবৃতির উপায় সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। বোধি লাভের ফলে বুদ্ধদেব চারটি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। যথা— (১) দুঃখ (২) দুঃখ সমুদয় (৩) দুঃখ নিরোধ এবং (৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ। এই চারটি আর্যসত্য "চত্বারি আর্যসত্যাপি" নামে পরিচিত।

"সর্বং দুঃখম" — একথা বুদ্ধদেব বলেছিলেন। জগৎ ও জীবন সব কিছুই দুঃখময়। মানুষের জীবনে সব কিছুই

দুঃখময়। জরা, ব্যধি, রোগ, শোক, মৃত্যু বাসনা জাত সবই আমাদের কাছে দুঃখময়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, জগৎ সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত বেদনার অশ্রুতে যে প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে সব সাগরের জলেরও কোন রকম তুলনা করা যায় না। আমরা দুঃখ ভোগ করি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলেন - দুঃখ অকারণে হয় না। দুঃখের কারণ আছে। কেননা জগতের উৎপত্তিশীল বস্তু বা কার্য মাত্রই কারণ নির্ভর। হঠাৎ করেও কোন কার্য বা বস্তুর উৎপত্তি হয় না। দুঃখ যেহেতু কার্য স্বরূপ সেহেতু দুঃখের কোন না কোন কারণ রয়েছে। তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে জানা যায় দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা। তবে বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কারণ হিসাবে এক কার্য কারণ শৃঙ্খলের কথা বলা হয়েছে। যথা - অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ। এই নিদান গুলি প্রত্যেকে একদিক থেকে কার্য আবার আর একদিক থেকে কারণ। তাই এরা কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমাদের অতীত জীবন, বর্তমান জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবন- এই দ্বাদশ নিদান বা কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে।

জীবনের ঘূর্ণমান চক্র থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, সংসারে তথা জীবনে দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা। ফলে অবিদ্যাকে নাশ করতে পারলে দুঃখ বা সংসার জীবন থেকে আমাদের চিরমুক্তি সম্ভব হবে। এই মুক্তির অবস্থাকে বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ বলা হয়েছে। ফলতঃ তৃতীয় আর্যসত্য হল দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণ। নির্বাণ লাভ করলে দুই ধরনের সুবিধা রয়েছে। প্রথমতঃ পুনর্জন্ম রোধ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ বর্তমান জীবনে দুঃখের নাশ হয়। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব নির্মূল হয়।

দুঃখ নিরোধ হলে অবশ্যই তার মার্গ রয়েছে। মার্গ বলতে এখানে উপায়ের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং দুঃখ নিরোধ মার্গ হচ্ছে চতুর্থ আর্যসত্য। বুদ্ধদেব নিজে এই মার্গ অনুসরণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এই নির্বাণ লাভের আটটি পথ রয়েছে। যথা — সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মাপ্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই মার্গ গুলিকে অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করলে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ও নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হবে।

বুদ্ধদেব বলেন, চূড়ান্ত সম্ভোগের জীবন যেমন দুঃখময় তেমনই কঠোর আত্মনিগ্রহের জীবন ও পরান দুঃখময়। তাই এই উভয় পথের মধ্যম পথকেই মুক্তির পথ বলা হয়েছে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই পথ অনুসরণ করে নির্বাণ লাভ করতে পারে। কেবল যাগযোজ্ঞাদির তপস্যার দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। ঈশ্বরের দয়া বা করুণার দ্বারাও দুঃখ নিবারণ হয় না। কারণ ঈশ্বর কোন বাস্তব বিষয় নয়। মানুষ মাত্রই শক্তির অধিকারী। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে সুপ্ত ভাবে( pottentially ) অনন্ত সূর্যশক্তি। নিজের চেষ্টাতে এই সুপ্তশক্তিকে প্রকাশ করতে পারলেই সংসার জীবনের দুঃখ নিবারণ সম্ভব হবে। তাই বুদ্ধদেব বলেছেন — 'আত্মদীপ ভব'। অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় আপন দীপ্তিতে তুমি উদ্ভাসিত হও।

## 'ব্যক্তি'-গত

প্রীতিন দত্ত
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

কবি সুকান্তের নবজাতকের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার ছিল " চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণ পণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল/এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি......'' তা করতে গিয়ে তিনি সর্বসুন্দর এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন যা 'ফল', 'ফুল' আর 'পাখিরও কুজনে' কানাচে কানাচে পূর্ণ আর ততোধিক বর্ণময়ী। মজার কথা তার এই অঙ্গীকারের প্রায়োগিক রূপটি ফুটে উঠেছে যে কবিতায় তার নাম 'আগামী'। আজ বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের হাত ধরে আমাদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি জীবনকে এক প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে পর্যবসিত করেছে যেখানে প্রকৃতির সাথে নিজের একাত্ম হওয়ার অবকাশ কেবলই অলীক কল্পনার নামান্তর। তবু এই বাস্তুবাদীদের ভিড়ে দুর্ভাগ্যবশত আমার মতো আপনভোলা, বোহেমিয়ান মানুষ চায় এক জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর খুঁজতে উন্নতির এই উচ্চতায় আরোহণ করার পরও সভ্যতা, মানবজাতি কেন সংকটের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে? আমরা যন্ত্রমানব বানিয়েছি যা নিয়ে আমাদের অফুরন্ত আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু আমি তো চতুর্দিকে শুধু মানবযন্ত্র দেখি যে মানব যন্ত্রকে নয়, যন্ত্র মানবকে পরিচালনা করে। আজ সম্পর্কের অবসান হলে কতজন Browning এর 'The Last Ride Together' পড়ে জানি না তবে নিশ্চিত যে তার থেকে "সঁইয়া জি সে আজ ম্যায়নে ব্রেক আপ কর লিয়া'' শোনার সংখ্যা অনেক বেশী। কিশোর কবি তার 'ছাড়পত্র' ও 'আগামী' রচনায় কি ওই রকম আগামীর কল্পনা করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে ছেলে বেলায় দুরদর্শনে শোনা একটি পুরাতন বাঙলা চলচ্চিত্রের গানের কথা মনে পড়ছে-

"শোনো বন্ধু শোনো
প্রাণহীণ এই শহরের ইতিকথা।
ইঁটের পাঁজরে, লোহার খাঁচায়
দারুণ মরম ব্যথা......."

মানবযন্ত্রের যুগে ইন্টারনেট তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বত্ত্বার ভ্রান্তিবিলাস ঘটিয়ে ছেড়েছে। এখানে Private ও Public একাকার হয়ে গিয়েছে। সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অনুপ্রবেশ আমরা মহানন্দেই উপভোগ করছি। এখানে 'ব্যক্তিগত' এখন সুকান্তের 'আগামী'র মতোই গত হয়েছে। ফেসবুক, হোয়াট্‌স অ্যাপ, টুইটার-এ নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মুহুর্ত তুলে ধরা ও অনুভূতি প্রকাশ করায় যে অযৌক্তিক গর্ব লুক্কায়িত রয়েছে তা আমার মতো 'পাগলা জগাই' (শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীর একটি আধুনিক বাংলা গানের কেন্দ্রীয় চরিত্র) এর পক্ষে বোধগম্য নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে ভ্রাম্যমান জগৎ তৈরী হয়, দৃশ্যত তা বাস্তবের রেপ্লিকা মনে হলেও সেখানে পৌঁছে যে আঘাত অনেকে পায় তার দাম দিতে হয় এই বাস্তবেই। প্রতিনিয়ত সংবাদ মাধ্যমে পাওয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের খবরই তার প্রমাণ। 'ব্যক্তিগত' যদি গত-এর ইতিহাস হিসাবে বিস্তৃত হয় তাহলে আগামী যে বিপজ্জনক বলা বাহুল্য।

যাই হোক এই 'গত' ও 'আগামী'র গোলক ধাঁধাঁয় আমাদের মনের অন্দর মহল আজ জর্জরিত। ইন্টারনেটের ফলে শিশুরা আজ শিশু বটে, তবে আর সে নেই ছোট। তারা যদি শোনে "আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা, স্বপ্নদোলা

নাচিয়ে আয়'' হাসতে হাসতে বলবে "আবোল তাবোল'' বলছে। আজ তারা বলবে না " Little children want to play, rain rain go away '' কারণ ইন্টারনেট-কম্পিউটার তাদের হাতে তুলে দিয়েছে Video games এর সম্ভার। ফলে ওই যে বললাম শিশু আছে, শৈশব নেই।

এ প্রসঙ্গে এক মজার দৃষ্টান্ত পরিবেশন করছি। হামেশাই দেখি প্রকৃতি প্রেমীরা অনেকেই চোখের উপরে চোখ-এগুলি ধাপ পেরিয়ে তাকে দেখতে ব্যস্ত। অথচ একবারও মনে সেই কৃত্রিম চোখগুচ্ছ সরিয়ে খালিচোখে দেখার ইচ্ছেও আসেনা। এভাবেই আমরা প্রকৃতি থেকে নিজেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে রাখছি। ফলস্বরূপ মানুষ কোথায়? আগামী পৃথিবী ভরে উঠবে চর্মযন্ত্রে।

সর্বশেষ বলি সময় এসেছে ভাববার। আমরা প্রয়োজনে প্রযুক্তি ব্যবহার করব নাকি প্রযুক্তিকেই নিজেদের প্রয়োজনে পরিণত করব? তার প্রগতিশীল ও কল্যাণকারী ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু তা আমাদের মনে যান্ত্রিকতার জঞ্জাল সৃষ্টি করেছে। সেই জঞ্জাল সময় আগত। বোধ করি সুকান্তের অঙ্গীকারের পুননবীকরণ প্রয়োজনীয়। যা ব্যক্তিগত তা আর 'গত'র স্বপ্ন নয়, আগামীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা হয়ে উঠুক।

# বৈবাহিকের দপ্তর

## এক ভবঘুরের বইবাহিক আত্মকথন ও একটি বিস্মৃত অভিজ্ঞান

[সম্পাদকের নোট : 'বইবাহিকের দপ্তর' একটি ধারাবাহিক রচনা। এই সংখ্যা থেকে শুরু হলো। কলেজের বাৎসরিক পত্রিকায় প্রতি বছর একটি করে দপ্তর প্রকাশিত হবে। নানা কারণে লেখকের নাম গোপন করা হলো । লেখকের অনুমতি পেলে যথাসময়ে আমরা তাঁর নাম প্রকাশ করব। দপ্তরের বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। লেখক নানা সময়ে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘুরে বেড়ান। এটি তাঁর আবাল্য অভ্যাস। দুষ্প্রাপ্য কিম্বা সহজলভ্য, পোকায় কাটা বা ঝাঁ চকচকে, ফুটপাথ বা শোরুম, নবীন বা প্রবীণ, জীবিত অথবা বর্তমান, জনপ্রিয় কিম্বা অখ্যাত, স্বনামধন্য কিম্বা পাঠক প্রত্যাখ্যাত, প্রচারকামী অথবা নির্জন স্বভাবের যে কোনো লেখকের বাংলা ভাষায় যে কোনো বই সংগ্রহ করা ও পড়া এই দপ্তরলেখকের জীবনের একমাত্র কাজ। যদি অবশ্য সেই প্রবৃত্তিতে কিছু সারবস্তু থাকে। একে একজনের বাতিকও বলা যেতে পারে। কোনো বই ভালো লেগে গেলে অর্থাৎ বইটির মধ্যে সার ও রস পেলে তিনি সেই বইটি সম্পর্কে কিছু মতামত দিয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, সেই মত বা মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। সেগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এমন বাতিকগ্রস্ত মানুষ এ কালে বিরল । এঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল হবে বলেই আমরা মনে করি। কিছুদিন পূর্বে [illegible] গভর্নমেন্ট কলেজের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি ও লেখা চাই। তিনি আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে বছরে একটা করে লেখা দিতে সম্মত হন। এই রচনাটি তারই প্রথম কিস্তি।]

তারপর যেতে যেতে যেতে...না, কোনো নদীর সঙ্গে দেখা হইলো না। নদী তাহার সব ভার ও আবর্জনা সকল বহন করিয়া কালসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে কিনা বলিতে পারি না। শুধু এটুকু বলিতে পারি, মনুষ্যজাতির একটি বড়ো ব্যাধি হইল বিস্মৃতি। বাঙালিদিগের মধ্যে ইহার প্রকট প্রাদুর্ভাব ইহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য বিস্মৃতি কখনওকখনও কাম্য ও সুখদায়ীও বটে। পলি জমিলে ভূমি উর্বরা হয়। তাহাতে যে সুফসল ফলিবে না, কেহ তাহা বলিতে পারে না। তবে কে তাহা ঘরে তুলিবে বলা শক্ত। আমি নিতান্ত এক ভবঘুরে। কলিকাতার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীটদষ্ট বিস্মৃত ও বর্জিত পাঠককুলের অরুচির কারণে প্রত্যাখ্যাত গ্রন্থসকল হস্তগত করিতে ঘুরিয়া বেড়াই। কেবল অপ্রচলিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও বহন করিয়া থাকি বলিয়া এতদঞ্চলের ফুটপাথের পুস্তকবিক্রেতাগণ ও প্রকাশকদের কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া এই অবিবাহিত ব্যক্তিটিকে বইবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। তাহাতে অধম পুলকিত কি বিচলিত বোধ করেন না। তিনি কেবল ঐ গ্রন্থসকল চর্বনা (কী প্রকারে গ্রন্থ চর্বনা করিতে হয় তাহা লইয়া এক্ষণে আলোচনা মুলতুবি রাখিলাম । কারণ স্থানকাল বিবেচনা বোধ আমার আছে।) করিয়া তাহাতে কিছু রসের সন্ধান পাইলে মাসিক ত্রৈমাসিকগুলিতে পাঠাইয়া দেন। তাহার কিছু কিছু ছাপা হয়। কিছু অর্থাগমও ঘটে। তাহাতে বইবাহিকের গ্রাসাচ্ছাদনের আংশিকব্যবস্থা হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ রচনা বাতিল হইয়া যায়। ইহাতে তিনি আরও বেপরোয়া হইয়া আরও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

যাহা বলিতেছিলাম, নদীর সঙ্গে দেখা হইল না বটে, কিন্তু অতি সম্প্রতি একটি গল্পের বইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। নিত্য চক্র কলেজ স্ট্রিট পাড়ার অলিগলিতে ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে হ্যারিসন রোডের ফুটপাথে আসিয়া পড়িলাম। মুনির সেখ বইপত্তর গুটাইতেছিল। আমাকে দেখিয়া পানের কষে কালো হইয়া যাওয়া কোদালদর্শন দন্ত বিকশিত করিয়া বলিয়া উঠিল, 'দেখুন দিকি, আপনের উপযেগী কিনা। সারা দিনমান বইখানা বিকিরি হলো নে। আপনে তো পুরোনো বইটই ন্যান আমার কাছ থেকে।' মলাট দলাট কিনা বলিতে পরি না। তবে মুনির সেখের হাতে বইখানির মলাট আমার নজর কাড়িল। কালের করাল গ্রাস এখনও ইহার সৌন্দর্য হরণ করিতে পারে নাই। বনেদি বাড়ির প্রবীণা বধূর মূল্যবান শাড়িশোভিত দেহবল্লরীর ন্যায় বইটির মলাট দেখিলাম এখনও অবিকৃত রহিয়াছে। গ্রন্থকীটের অত্যর্খযাপনের পরেও বইখানির কান্তি বড়ো মনোহর। লাল পটের উপর সাদা কালো বাসন্তী রঙের সমাহারে অতি বিষণ্ণ দুইটি নরনরীর মুখ চিত্রিত। যামিনী রায়ের শিল্পকলাকে অত্যাধুনিক ভাষায় অনুবাদ করিলে বোধহয় এমনটি দাঁড়াইবে। উপরে সাদা রঙে গ্রন্থের নাম ও কালো রঙে গ্রন্থকারের নাম মুদ্রিত রহিয়াছে। গ্রন্থের নাম অভিজ্ঞান। গ্রন্থকারের নাম প্রভাত দেবসরকার। দেখিলাম প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম অতি সুপরিচিত কবি চিত্রকর ও চলচ্চিত্রকার শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী। গ্রন্থকারের নাম কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। যা হৌক প্রচ্ছদশিল্পীর কারণে পাতা উলটাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, গ্রন্থটির প্রকাশ কাল মাঘ, ১৩৯০। গ্রন্থখানি যে সুসম্পাদিত তাহার কিছু নজির দেখা যাইতেছে। প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থ সম্পাদনা যে করিতে হয় সে বোধ এ দেশে এখনও জাগ্রত হয় নাই । কিছুটা অবাক হইলাম। দেখিলাম, গ্রন্থের শেষে প্রতিটি গল্পের প্রকাশ কাল ও পত্রের নামোল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থের আদি গল্পটি 'পিপাসা' যাহার নাম, প্রকাশিত হইয়াছে দেশ পত্রিকায়, ১৯৬৩ সনে। আজি হতে প্রায় অর্ধ শতক পূর্বে। 'দেশ' বাংলা ভাষার অতি সম্ভ্রান্ত পত্রিকা তাহাতে বিতর্ক নাই। এই পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হইলে আনন্দে লেখকগণ বগল বাজাইয়া থাকেন। এই আচরণকে দোষ দেওয়া যায় না। শেষ গল্পটির রচনাকাল ১৯৭৭ সন, 'গল্প ভারতী' পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ গল্পই প্রকাশিত হইয়াছে দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায়। কয়েকটি গল্প বিবৃত হইয়াছে পরিচয়, অমৃত, স্বাধীনতা, মধ্যবিত্ত, স্বরাজ প্রভৃতি পত্রে। অর্থাৎ লেখককে একেবারে এলেবেলে ভাবিবার কারণ নাই। দেশ ব্যতিরেকে বাকি পত্রিকাগুলিও যথেষ্ট নামী ও মানী । গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশ ভবন হইতে। উৎসর্গ করা হইয়াছে 'বাংলা ছোটোগল্পের পাঠকদের উদ্দেশে'। দাম : কুড়ি টাকা। আমি মুনির সেখকে আট টাকা দিয়া বইটি হস্তগত করিলাম। মুনিরের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে প্রাপ্যের অধিক পাইয়াছে। পড়িলেই বুঝিব আমার কষ্টার্জিত টাকা জলে গেল কিনা। আজকাল সম্পাদকদিগের কাছ হইতে সামান্য সম্মানদক্ষিণা অর্জন করিতে গেলে বাটার দুই জোড়া চপ্পলের স্বর্গারোহনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হয়।

অতঃপর পাতা উলটাইতেই চমৎকৃত হইলাম। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন এক কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ডাকসাইটে লেখক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয়। দেখিলাম লেখক নিজেও একটি ছোটোখাটো ভূমিকা লিখিয়াছেন। গল্পগ্রন্থে কোনো ভূমিকা লিখিবার প্রয়োজন আছে কিনা এই কূট প্রশ্ন কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিয়া উভয় ভূমিকা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এবং বুঝিলাম কেন প্রখ্যাত লেখক তাঁর সমকালের অখ্যাত লেখকের কিছুটা অনুরোধে বাকিটা কর্তব্যবোধের তাড়নায় এই ভূমিকা লিখিয়াছেন। শ্রীঘোষ জানাইয়াছেন, লেখক তাঁহার সমকালের একজন ছোটোগল্পকার এবং বন্ধুও বটেন। লেখকের গ্রামের 'মালা' নামক বাড়িতে লেখকবন্ধুরা চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সহযোগে আড্ডা মারিতেন। এবং 'প্রভাতের স্মিতস্নিগ্ধ সহৃদয় আতিথেয়তা'য় মুগ্ধ হইতেন। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি গল্পের রসাস্বাদন করিয়া লিখিয়াছেন, 'এমনই গল্পের পর গল্প পড়ে গেছি একই সঙ্গে আনন্দে অবাক, আর ঈর্ষায় নীল হয়েছি। প্রভাত পেরেছে, আমি তো কই পারিনি! ...এই বইয়ে প্রভাত দেবসরকারের সব শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রথিত হয়েছে কিনা বলতে পারব না—তবে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প—অন্তত আমাদের ভাষায়, আমার পড়াশোনার সীমানায়—খুব বেশি নেই।' এই মন্তব্য পড়িয়া গল্প পড়া স্থগিত রাখিয়া আমি দুইটি আশু কর্তব্য ঠিক করিলাম। এক—লেখকের জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য যাহা করা কর্তব্য তাহা এক্ষণে আমার সাধ্যাতীত বলিয়া আন্তর্জালিকার আন্তর্জালিক ভুবনে জাল পাতিলাম। মণিমানিক্য দূর অস্ত, জালে এক আধটি গেড়িগুগলিও উঠিল না। দুই—প্রকাশকের ঘরে ছুটিয়া আসিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম, এত বড়ো লেখক যখন এমন সপ্রশংস ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় বেশ ভালোরকমের বিক্রি হইয়াছে। তাক ভর্তি বই দেখাইয়া প্রকাশক হতাশ করিলেন। বুঝিলাম, এই লেখকের কপাল পুড়িয়াছে। মনে হইল, শ্রীঘোষ বন্ধুকৃত্য করিতে দুচারিটি কথার কথা লিখিয়া দিয়াছেন মাত্র। বোধহয় চর্ব্য চোষ্য তথা বিশেষ করিয়া 'পেয়'-র প্ররোচনায় ইহা ঘটিয়া থাকিতে পারে।

অতঃপর পাতা উলটাইতেই চমৎকৃত হইলাম। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন এক কালের বাঙলা সাহিত্যের ডাকসাইটে লেখক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয়। দেখিলাম লেখক নিজেও একটি ছোটোখাটো ভূমিকা লিখিয়াছেন। গল্পগ্রন্থে কোনো ভূমিকা লিখিবার প্রয়োজন আছে কিনা এই কূট প্রশ্ন কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিয়া উক্ত ভূমিকা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এবং বুঝিলাম যেন প্রখ্যাত লেখক তাঁর সমকালের অখ্যাত লেখকের কিছুটা অনুরোধে বাকিটা কর্তব্যবোধের তাড়নায় এই ভূমিকা লিখিয়াছেন। শ্রীঘোষ জানাইয়াছেন, লেখক তাঁহার সমকালের একজন ছোটোগল্পকার এবং বন্ধুও বটেন। লেখকের গ্রামের 'মালা' নামক বাড়িতে লেখকবন্ধুরা চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সহযোগে আড্ডা মারিতেন। এবং 'প্রভাতের স্মিতস্নিগ্ধ সহৃদয় আতিথেয়তা'য় মুগ্ধ হইতেন। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে কয়েকটি গল্পের রসাস্বাদন করিয়া লিখিয়াছেন, 'এমনই গল্পের পর গল্প পড়ে গেছি একই সঙ্গে আনন্দে হরষে, আর ঈর্ষায় নীল হয়েছি। প্রভাত পেরেছে, আমি তো কই পারিনি! ...এই বইয়ে প্রভাত দেবসরকারের সব শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রথিত হয়েছে কিনা বলতে পারব না—তবে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প—অন্তত আমাদের ভাষায়, আমার পড়াশোনার সীমানায়—খুব বেশি নেই।' এই মন্তব্য পড়িয়া গল্প পড়া স্থগিত রাখিয়া আমি দুইটি আশু কর্তব্য ঠিক করিলাম। এক—লেখকের জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য যাহা করা কর্তব্য তাহা একণে আমার সাধ্যাতীত বলিয়া আজিকালিকার আন্তর্জালিক ভুবনে জাল পাতিলাম। মণিমানিক্য দূর অস্ত, জালে এক আধটি গেঁড়িগুগলিও উঠিল না। দুই—প্রকাশকের ঘরে ছুটিয়া আসিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম, এত বড়ো লেখক যখন এমন সপ্রশংস ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় বেশ ভালোরকমের বিক্রি হইয়াছে। তাক ভর্তি বই দেখাইয়া প্রকাশক হতাশ করিলেন। বুঝিলাম, এই লেখকের কপাল পুড়িয়াছে। মনে হইল, শ্রীঘোষ বন্ধুকৃত্য করিতে দুচারিটি কথার কথা লিখিয়া দিয়াছেন মাত্র। বোধহয় চর্ব্য চোষ্য তথা বিশেষ করিয়া 'পেয়'-র প্ররোচনায় ইহা ঘটিয়া থাকিতে পারে।

অতঃপর খানিকটা হতাশ হইয়া গল্প পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমে লোকাল ট্রেনের ন্যায় স্টপেজ দিতে দিতে পড়িতে লাগিলাম। পরে হা-ঘরের ন্যায় গো-গ্রাসে গিলিতে লাগিলাম। যে জীবন আমার হাতের তালুর ন্যায় পরিচিত, অনিত্য দিনপাতের প্রবাহে তাহাতে যে নিত্য সত্য সকল ভাসমান তাহাই দেখিতে পাইলাম। গল্পগুচ্ছ হইতে যে তরী প্রেমেন্দ্র মানিক তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ প্রমুখকে লইয়া আজিকার ঘাটে ভিড়িয়াছে, এই লেখক সেই নৌবাহিনীরই একজন সমর্থ নাবিক বলিয়া বোধ হইল। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল। কিন্তু হায়! ইনি অতিশয় কৃপণ। আর লিখন নাই। যদিও বা লিখিয়া থাকেন তো তাহা অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। বড়ো দুঃখ হইল। বঙ্গীয় পাঠককুলের উপর রাগ হইল। ইহাকেই বলে অমৃতে অরুচি! কীসে যে তাহার রুচি কে বলিবে! কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় প্রত্যহ বস্তা বস্তা অখাদ্য বিকাইতেছে! আর ইহাকে পোকায় কাটিতেছে। সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দ্যাশ! এই খেদ হইতেই প্রভাত দেবসরকার তাঁর অভিজ্ঞানের ভূমিকা 'লেখকের কথা'য় লিখিয়াছেন, "সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বাংলা ছোটোগল্প সমাদৃত হলেও বাঙালি পাঠক এখনও সংকলিত, পুস্তকাকারে প্রকাশিত বাংলা ছোটোগল্প সম্বন্ধে বিশেষ (আদৌ?) উৎসাহী বা আগ্রহী নন। যাঁরা প্রকাশক তাঁরা বলেন, গল্পের বই? ও চলবে না: উপন্যাস দিন, চালিয়ে দেব। অর্থাৎ একটানা গল্প চাই, তা যেমন তেমন হোক। অথচ এই ছোটোগল্প নিয়েই বিশ্বসাহিত্যদরবারে একাসনে বসবার অধিকারী হয়েছি আমরা—যেখানে আমাদের উপন্যাসের কোনো স্থান নেই।"

একেবারে হক কথা বলিয়াছেন লেখক। আমরাও লেখকের সহিত সহমত পোষণ করিয়া এই লেখকের গল্পগুলি বিষয়ে দুচারিটি কথা বলিব যাহাতে আমাদিগের চক্ষু ফুটে। গ্রন্থটিতে সাকুল্যে একুশখানি গল্প রহিয়াছে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হইয়াছে কিনা, এবং গল্পগুলি আদৌ ভাবনগরীর দূত, নাকি রসনাগারের ঠিকানা তাহা পাঠকগণই পড়িয়া স্থির করুন। একণে আমরা একটি গল্প পর্যালোচনা করিয়া সন্তোষবাবুর ভূমিকা কতখানি যথার্থ তাহা বিচার করিয়া লইব। বিচারে যদি সাব্যস্ত হয় সন্তোষবাবু যথার্থই

বলিয়াছেন, তাহা হইলে পাঠকদিগকে এই গ্রন্থখানি পড়িবার পরামর্শ দিব। এই লেখকের কলমচারিতার কাল আমরা জানিয়াছি—বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশক। বুটা আজাদির রঙ তখন আরও ফিকা হইয়াছে। জিনিসপত্রের দাম মধ্যবিত্তের নাগাল ছাড়াইয়াছে। চাকুরি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। খাদ্য আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতির মধ্যে চলিতেছে নানা ভাঙচুর ও টানাপোড়েন। কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। বিগত শতাব্দীর মূল্যবোধ বাঁচিয়া থাকিলেও তাহাতে পচন ধরিয়াছে। তবু মানুষের বাঁচিবার আকণ্ঠ পিপাসা তাহাকে এতটুকু দমাইতে পারে নাই। এই অতিপরিচিত জীবনের মধ্যে যে অজানা অচেনা আলোর-কালোর মাখা অভিজ্ঞান রহিয়াছে তাহাই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন লেখক।

পিপাসা গল্পটির কথাই ধরা যাক। কলিকাতা মহানগরীর নিম্নবিত্ত পাড়ায় একটি জীর্ণ বাড়িতে থাকে তিনটি ভিন বয়সী বৌ। বড়োটি বিধবা হইলেও তিনটি বৌয়েরই জীবন কাটে বিধবার অভ্যস্ত যাপনে। হতদরিদ্র সংসার। কে যেন চাল যোগায়। যে যোগায় তার সঙ্গে ছোটো বৌটিরই নাকি কথাবার্তা হয়। এই সব কূটতর কথা উঠিলে মেজ বৌ জানাইয়া দিতে ভোলে না, 'ওকে (ছোটোকে) বলবে না তো কাকে বলবে, তোমাকে আমাকে দেখে তো আর সে সেধে সেধে চাল খাওয়ায় না।' পড়িতে পড়িতে পাঠক চমকাইয়া উঠিবেন কালোজীবনের এহেন পরিচয় পাইয়া। কিন্তু ইহার পাশে আলোজীবনও রহিয়াছে। বড়ো বৌটি কেবল স্বামীকে হারান নাই, সন্তানটিকেও হারাইয়াছেন। মেজো বৌটির স্বামী নিখোঁজ। ছোটোটির বর চাকরির চেষ্টায় বোম্বাই গিয়া আর ফিরিয়া আইসে নাই। এহেন তিনটি বৌয়ের জীবনে আসিলো একটি পুরুষ। বসত পাড়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে একটি অফিস। সেই অফিসে চাকরি করা যুবক এই তিন বৌয়ের জীবনে তিন রকমের চাঞ্চল্য ঘনাইয়া তুলিল। তিনজনেই তাহাকে দিনের তিনটি ভিন্ন সময়ে তৃষ্ণার জলদান করিয়া থাকে। সত্যিকারের পিপাসা অভ্যাসে পরিণত হইল। মেজো বৌটি কিছু ভোজ্যও দিয়া থাকে। বড়ো বৌটির জল দেওয়ার মধ্যে সঞ্চারিত হয় বাৎসল্য। মেজোটি ভোজ্যপানীয় দেয় দাম্পত্যে অনুরঞ্জিত হইয়া। আর ছোটোটি মধুর রসে প্লাবিত হইয়া যুবাটিকে জল পান করায়। ইতোমধ্যে পাড়ার মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষাকারী অভয়পদ দলবল জুটাইয়া এই 'জলকেলি' বন্ধ করিতে আগাইয়া আসিল। যুবাটিকে উত্তমমধ্যম দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল। গোলমাল মিটিয়া গেল। কিন্তু গল্পে লেখক আরও কয়টি বাক্য খরচ করিলেন। পাড়ার অভিভাবক অভয়পদ অভিভাবকহীনা বৌগুলির তদারক করিতে আসিয়া দেখিল, 'হাড়-পাঁজরা-বার-করা, পলেস্তারা-খসা দুখানা ঘরের জঠরে কুলুঙ্গিতে তিনটি পরিপূর্ণ পানীয় জলের পাত্র রাখা আছে—কে জানে তিনটি বৌ সময় বুঝে জলপানের বাসনায় তিনটি বিভিন্ন পাত্রে জল ভরে রেখেছে কিনা।' লেখক ভাঙ্গিলেন না, পাঠককে খোলসা করিয়া বলিলেনও না—গ্লাস ভরা থাকিত না খালি? কাহাদের নিমিত্ত সেই পানীয় পরিবেশিত হইত? সেকি নিজেদের জন্য? নাকি অন্য কাহারও প্রত্যাশায়? এতই সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনায় ভরা এ গল্পের সমাপ্তি। এই তৃষ্ণার নামই কি জীবনপিপাসা? যা আমাদিগের জীবনে নানাভাবে নিত্য প্রবহমান? তারই অভিজ্ঞান কি এই গল্পটি? পাঠক বুঝিয়া লউন।

হাঁড়ির একটি ভাত টিপিলে যেমন সমগ্র হাঁড়ির হাল জানা যায় এখানেও আমরা তদুদ্দেশ্যে তাই করিলাম। ইচ্ছা করিয়াছিল সকল গল্পগুলির রসাস্বাদনের বিবরণ লিখিয়া আপনাদিগের পাতে তুলিয়া দিই। কিন্তু বঙ্গীয় মাসিক-ত্রৈমাসিকের সম্পাদকগণ অতীব কৃপণ—ইঁহারা না জায়গা ছাড়েন, না পয়সা। তথাপি আরও কয়েকটি গল্পের আলোচনা না করিলে পাঠকদিগের প্রতি বঞ্চনা করা হয় বিবেচনা করিয়া আর দুইটি গল্পের পরিচয় দিব। প্রথমটি হইল একটি নীল আকাশ, অপরটি গ্রন্থনামের গল্পটি। 'একটি নীল আকাশের' প্রধান চরিত্র অনিমা চারটি সন্তানের জননী হইলেও তাহার রূপ ঝরিয়া যায় নাই। উপরন্তু এক অতি গরীব করণিকের ঘরনী। কয়েক দিনের বাদলা কাটিয়া গিয়া নীল আকশ বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া অনিমা পুলকিত। কিন্তু তাহার স্বামী ইহার আনন্দ লইতে পারে না। তবু অনিমার জবরদস্তিতে সেইদিন তাহারা পুত্রকন্যার হাত ধরিয়া লেকে বেড়াইতে গেল। বাহিরে যাইবার মতো পুত্রকন্যাদিগের গায়ে-পায়ে তেমন ব্যবস্থা করা যায় নাই বলিয়া স্বামীপ্রবরটির মধ্যবিত্ত হীনতাবোধের জন্য তাহাদিগের বেড়ানোটি জমিল না। বাসে করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। বাসে কে যেন অনিমার সংক্ষিপ্ত নাম ধরিয়া ডাকিল। অনিমা সাড়া দিল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া অতঃ পতি-পত্নীর কথোপকথন এইরূপ হইল :

'বাসে কে যেন তোমার নাম ধরে ডাকছিল। এমন করলে, যেন লোকটাকে চেনই না!'

'চিনিই না তো!'

'সত্যি চেন না লোকটাকে? আচ্ছা অসভ্য লোক তো! তখন আমায় বললে না কেন?'

'বললে কী করতে? মারধর নিশ্চয়ই!'

'না, চেনা নেই জনা নেই, অমন করে ডাকবে কেন—কী রকম ভদ্রলোক, তাই ভাবছি।'

'কেন তোমার মান গেছে?'

'গেছেই তো! যত সব স্কাউন্ড্রেল!'

আলোটা বিনা নোটিশে নিভিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় অনিমা বললে : 'না গো না, মান তোমার রক্ষে হয়েছে! যে ডেকেছিল, সে আমার চেনাই, বিয়ের আগে আমাদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু বাসের মধ্যে সে পুরোন সম্বন্ধে চেনা দিয়ে লাভ কী?'

'কেন?'

'কেন আবার! ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে তেমন জামাকাপড় ছিল না,—সাড়া দিলে জানতো ওরা আমারই ছেলেমেয়ে! কী লজ্জার ব্যাপার হতো বলতো, ছি ছি!'

প্রাকবিবাহ প্রেমের কথা জানিতে পারিয়া ভদ্র পতিটিও অভদ্র হইতে পারে তাহার জন্য নহে, পুরানো প্রেমের লজ্জার কারণেও নহে, অনিমা আসলে ঢাকিতে চাহিয়াছে তাহাদের দারিদ্র। তাহার লজ্জা আসলে একটি নগ্ন সত্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। সেই সত্যের চাবুক কেবল অনিমার পতিদেবতাটির পিঠেই পড়ে না, সপাং সপাং করিয়া আমাদিগকেও চাবকাইয়া দেয়।

'অভিজ্ঞান' প্রেমের গল্প। এবং তা বড়োই জটিল। একটি বিবাহ উপলক্ষে রাজারহাটি গ্রামে আসিয়া জুটিয়াছে কলিকাতার কয়েকটি কিশোর। আর রহিয়াছে পাশের গ্রামের নারেন। তাহাদের চর্চার বিষয় ফুলবৌদি। সুন্দরী এই বৌটি তাহাদেরই সমবয়সী এবং কলিকাতা হইতে আগত। তাহাকে খুশি করিবার জন্য কিশোরদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। কেবল নারেন তাহাকে উত্যক্ত করে নানাভাবে। তবু ইহারই প্রতি ফুলবৌদির প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। বিদায়ের কালে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটিল। ফুলবৌদির চুলের গহন বন হইতে কে এক গোছা চুল কাটিয়া লইয়াছে। বিদায়ের প্রাক্কালে বৌদি এক গেলাশ জল খাইতে চাওয়ায় নারেন এক আজব প্রতিযোগিতার কথা বলিল। সেই প্রতিযোগিতায় জিতিলে ফুলবৌদির কাছে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে এই শর্তে নারেন এক কুঁজা জল খাইয়া মরণাপন্ন হইল। অতঃপর ফুলবৌদিকে ট্রেনে তুলিতে গিয়া তাহারা নারেনের বিষয়ে বৌদির কান ভাঙাইতে একটা কাগজের মোড়ক দিল। তাহাতে আবিষ্কৃত হইল ফুলবৌদির ছিন্নকেশ। তাহারা আরও দেখিল 'বৌদির চোখে জল'। পাঠকের মনে পড়িতে পারে সুবোধ ঘোষের 'চতুর্ভুজ ক্লাব' গল্পটির কথা। কিন্তু উক্ত গল্পটিতে উপজীব্য হইয়াছে নারীর বহুগামিতার সমাজতাত্ত্বিক দিকটি। আর এই গল্পে বিশ্লেষিত হইয়াছে নারীর মনোগহনের জটিল প্রেম। সন্তোষবাবু লিখিয়াছেন, 'এটা সেই জাতের কাহিনি, যা একই আধারে তেতো আর মিষ্টি।'

এই লেখকের গল্পগুলির ভাষা ও ভঙ্গি সম্পর্কে কিছু কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পিপাসা গল্পে নিম্নবিত্ত পাড়ার গলিতে হুড়মুড় করিয়া একটি লরি আসিল। তাহার পর দেখা গেল, গল্পের চরিত্রগুলিতে ব্যাপক নড়াচড়া শুরু হইয়াছে। লরিটি অতি অভ্যস্ত দিনযাপনের ভাঙচুরের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। ফলে গল্পটি হইয়া উঠিয়াছে অতি মিতবাক। প্রভাতবাবু কখনও কখনও পাঠককে কঠিন আঘাত করিয়া পরে পিঠে হাত বুলাইয়া দেন। কখনও স্নিগ্ধ মধুর চেনা সংলাপের মধ্যে বাজিয়া উঠে বিপর্যয়ের কাড়া-নাকাড়া। আবার কখনও আস্তি ক্লাইমাক্স সৃষ্টি করিয়া পাঠককে ধাঁধায় ফেলেন। যেমন দেখি বিনিয়োগ গল্পে—

> সুধাংশুর ভালো লাগে না এভাবে চোরের মতো অপেক্ষা করতে, একবার ভাবলে, চুপি চুপি সরে পড়ি। উঠলেও সুধাংশু। বারের চৌকাঠে পা দিতেই হঠাৎ বিকট একটা শব্দ পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত অসাড় করে দিলে। সুধাংশুর গা ঝিম ঝিম করে উঠলো। টলতে টলতে চেয়ারে এসে বসলে। ভেতরের দিকে পর্দাটা নিঃসাড়—গলায় দড়ি মতো ঝুলছে। গোঁ গোঁ করে শব্দটা এখনও হচ্ছে—সুধাংশুর মনে হচ্ছে তার মাথার উপর কে যেন তুরপুন বসিয়ে দিয়েছে। নীচের তলার ইলেকট্রিকের ঘানিটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সরিষা নিংসৃত খাঁটি তেলের কল—বেরিবেরি হয় না, দি মাস্টার ঘানি!

আর বলিব না। এবার পাঠকগণ পড়িয়া লউন। তাহা হইলেই বুঝিবেন, লেখক সমাজের কী অভিজ্ঞান রচনা করিয়াছেন আর আপনারা কী অভিজ্ঞান পাইলেন।

অভিজ্ঞান :: প্রভাত দেবসরকার
প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, মাঘ, ১৩৯০, কলকাতা--৭৩, মূল্য : কুড়ি টাকা

।। ইতি শ্রী বইবাহিক ।।

# বৃহন্নলা বনাম সমাজ

সুস্মিতা ঘোষ
ইংরেজি বিভাগ(প্রথম বর্ষ)

হিজড়ে বলতেই কী মনে হয়? - যা সব সময় দেখি, বাচ্চা হলেই বাড়ি বয়ে ঝামেলা করতে আসে, উৎকট গান গায়, নাচে, বিশ্রী অঙ্গ ভঙ্গি করে আর হাত তালি দেয়, চায় গাদা গাদা টাকা, মনে হয় ওটা যেন ওদের জন্মগত অধিকার। আর টাকা না দিলেই অকথ্য গালাগালি, খিস্তি।

আবার আমি কিন্তু অনেক হিজড়েকে ভদ্র ভাবে কথা বলতে দেখেছি। শুধু তাই নয় অনেকে আবার পড়াশোনার সাথেও জড়িত বলে শুনেছি। পড়াশোনা, আর ওরা!!- অবাক কান্ড...............

আমি ভেবে পাই না এতে অবাক হওয়ার কী আছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়েও তো ওরা তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি পেয়েছে, তাহলে কেন তারা শিক্ষা ও চাকরির দরজাটির থেকে অনেক দূরে? ট্রেনে, বাজারে, দোকানে টাকা তোলা ছাড়া পড়াশোনায় নিজেদের যদি জড়াতে পারে তারা - তাহলে ক্ষতি কী? তারাও আমাদের মতো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তাও সমাজ তাকে মানতে পারে না। কেন সমাজ তাদেরকে জায়গা দেয় না? কেন তারা পিছিয়ে? কেন সমাজ তাদের বিরুদ্ধে?- এই প্রশ্ন গুলো কী কখনও আমরা নিজেদেরকে করে দেখেছি? হুম!!! প্রশ্ন কী করবো, ওদের সম্পর্কে ভাবতেই তো অনেকের ঘেন্যা লাগে।

ফেসবুকে এক মিউজিশিয়ানের কথা পড়লাম, ট্রেনে কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাট যাবার পথে এক হিজড়ে এসে টাকা চায় তার কাছে। ওই বৃহন্নলার নাম ছিল মায়া। ভদ্রলোক দশ টাকা দেওয়ার পর মায়া তার কাছে জানতে চান আপনি কী করেন? মিউজিশিয়ান শুনেই মায়া তাকে বলেন, "মোৎসার্ট বা বেঠোফোন শোনাতে পারেন"? - চমকে যান উনি। জানতে পারেন মায়ার পড়াশোনা লন্ডনে, তার পর দেশে ফেরা। নিজের লিঙ্গের পরিচয়ের জন্য আর কাজ জোটেনি। শেলির লেখা পড়তে ভালোবাসেন মায়া। সত্যিই অবাক লাগছে হয়তো শুনতে।

আরও একটা ঘটনা, রাজু! নামটা পাল্টাতে হয়েছিল, আসল নাম বলা মানা। ক্লাস টেন পর্যন্ত একটা গল্প সবার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল। কলকাতা শহরে নামী স্কুলে পড়াশোনা, পড়াশোনায় ভালোই ছাত্রটি। সব সময়ই ভয়ে থাকতো, এই বুঝি সবাই বুঝে ফেলল। এই বুঝি বার করে দিল স্কুল থেকে। কিন্তু তার এই পরিচয় একদিন চলেই আসে সবার সামনে, বন্ধু বান্ধবীদের ছিঃ ছিঃ সহ্য করতে না পেরে ই.এম.বাইপাসে নিজের প্রাণটি দিয়ে দেয় রাজু, এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে। সত্যিটা একদিন না একদিন সামনে আসবেই, জানতো রাজু। লড়াইটা তার ছিল সমাজ ব্যবস্থার সাথে নিজের।

শুনেছিলাম, আমাদের পাড়ার বারোয়ারী মন্দিরটির পেছনের দিকের পাড়ায় একটা মস্ত বড়ো বাড়ি আছে, সেখানে নাকি কতগুলি বৃহন্নলা থাকে। তাদের নাকি একজন হেড ও আছে। শীলা নাম তার। এখন অবশ্য যথেষ্ট বয়সও হয়েছে তার। লোকের মুখে শোনা যায় উনি নাকি একদিন একটি ছেলেকে রাস্তায় কুড়িয়ে পান, তারপর থেকে তারাই ওই ছেলেটিকে মানুষ করে। বর্তমানে নাকি ছেলেটি স্কুলেও পড়ছে। আবার সে তাদেরকে 'মা' বলেও ডাকে। একজন বৃহন্নলা এক সন্তানের কাছ থেকে 'মা' ডাকটি শুনছে এর থেকে বড়ো তার জীবনে আর কিছু হয় না। কিন্তু কারোরই হয়তো জানা নেই সমাজ আর কতোদিন ওই ছেলেটিকে 'মা' বলে ডাকার অধিকার দেবে।

আজকাল অনেক সংগঠন তৈরী হয়েছে এই সম্প্রদায় গুলির সাহায্যের জন্য। সরকার এদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট এদেরকে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দিয়েছে- এই সব কিছুর মধ্যেও একটিই কিন্তু থেকে যায় যা হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। অনেকেরই ধারনা 'হিজড়ে' মানেই ভয়ঙ্কর একটা বিশ্রী রকমের জীব। যাদেরকে দেখলেই অন্যত্র মুখ ঘুরিয়ে নিজেকে ওই পরিস্থিতির সম্মুখীন না করাই শ্রেয়।

তারাও যেন কোনদিন সমাজে জায়গা পায়, মানুষ এই হিজড়ে সম্প্রদায়টির সম্পর্কে যে ধারণাটি নিয়ে চলেছে সেটিকে যেন পাল্টায়। তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো হিজড়ে অর্থে হি হি!!! এই তাচ্ছিল্য আর থাকবে না.....................

# মুসৌরির জঙ্গলে

সামিদুল সেখ (ইংরাজি)

পাহাড়ের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে পাহাড়ের স্বর্গীয় নিস্তব্ধতার সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভালো লাগেনা এমন বাঙালি খুজে পাওয়া বেজায় মুশকিল। বাঙালি মাত্রই সৌন্দর্য ও ভ্রমণ পিপাসু হবে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। পাহাড় আমার ভীষণ পছন্দের জায়গা, তাই আমাকে প্রায়ই পিপাসু করে তোলে। তাই এ দোষ আমার নয়, পাহাড়ের। ২১শে নভেম্বর যখন মুসৌরির উদ্দেশ্যে রওনা দিই তখন মনের মধ্যে অন্য বারের থেকে একটু বেশী উত্তেজনা। কারণ এই প্রথমবার যচ্ছি ট্রেকিং করতে তাও আবার পরিবার ছাড়া সম্পূর্ণ একা। আমরা তথা কথিত ইয়ংস্টাররা প্রথম দুটি বাসে এবং সাম্প্রদায়িক কালে (২০১০) এভারেস্ট জয়ী বসন্ত সিংহ রায় (কৃষ্ণনগর) ও সহ প্রবীনদের অন্য একটি বাসে তুলে দিয়ে আমরা ইয়ংস্টার ছেলে মেয়েরা উঠে পড়লাম। যাত্রা শুরু হল মুসৌরির উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যা ৭টায় পৌঁছালাম বিহারের রাজধানী পাটনাতে, সেখানে কিছু হালকা খাবার খেলাম। পরের দিন লক্ষ্মৌ আর ওই দিন সন্ধ্যায় হরিদ্বারে পৌঁছলাম। যেখানে গঙ্গা গোমুখ থেকে উৎপত্তি হয়ে উচ্চ গতিতে এসে তার উচ্চ গতি শেষ করেছে। এখানে রয়েছে অসংখ্য শিব মন্দির, বহু পুণ্যার্থী, পর্যটক এবং অর্ধবস্ত্র পরিহিত শিব মূর্তী। যাই হোক আমরা হরিদ্বার দর্শনের পর অবশেষে রাত্রি ১টা নাগাদ মুসৌরিতে পৌঁছালাম। আমাদের ব্যাসক্যাম্প যেতে সময় লেগে গেল আরও ৩০ মিনিট। চারিদিক ছিমছাম জায়গা, চারিদিকে পাহাড়ের উপত্যকা, আর নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা নদী। ক্যাম্পের পাশে বন্য ডালিয়া ফুল ও ঘাসের ঢাল দেখে ঠিক মনে পরছিল সুইজারল্যান্ডের কথা। ঘাসের ঢাল অঞ্চলটি রবি ঠাকুরের "বলাই" আর ঘাসের ঢাল নিয়ে কথা গুলি স্মরণে আসছিল। জ্যোৎস্নার রাত্রিতে পাহাড়ের উপরে বসে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখছিলাম। জীবনে কখনো এমন ভাবে চিন্তাহীণ হয়ে কোন কিছুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়নি।

সকাল হয়ে এলে আমরা ট্রেকিং এ বেড়িয়ে পড়লাম। আধখানা চাঁদের মতো ভারতের উত্তর দিক জুড়ে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। এই হিমালয়ের সবচেয়ে বড় শিখরের নাম এভারেস্ট। আর মুসৌরি পরে দুন উপত্যকার মধ্যে। মুসৌরিতে অবশ্য সারা বছর বরফ পরে না। কিন্তু অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে বরফ পরে। উষার আলোয় চারিদিক ঝিক্ মিক্ করে ওঠে।

পাহাড়ি দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে মুসৌরির জঙ্গলে পৌঁছালাম। সে কি জঙ্গল, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। পাহাড়ি রাস্তায় প্রথম চলা তাই এমন অভিজ্ঞতা নেই। একজন পথচারি বললেন, 'বহুত ঠান্ডা সামালকে চলো ভাইসাব'।

সত্যিই উত্তরের হাওয়া যেন দৈত্যের মতো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। দেখে মনে হল হাওয়ার দাপটে বন্য ডালিয়া ফুল গুলি তাদের কোমল মাথাগুলি নাড়িয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছিল। তারাও যেন প্রাণবন্ত হয়ে আমাদের সাথে পথ চলতে চায়। এই জঙ্গলে ট্রেকিং করতে হলে প্রধানত এক ক্ষুদ্র বিভীষিকা প্রাণী জোঁক, বিষধর সাপ এবং বন্য চিতা তো আছেই এগুলি স্মরণে রাখতে হবে। আমরা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে দেখতে লাগলাম পাহাড়ের উপর গভীর অরণ্য। বেলা পড়ে এল আর পারছিনা, ইতিমধ্যে কন্‌কনে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাতে শরীর অবশ হয়ে আসছে। পেশিতেও টান ধরেছে, একটা গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। এর মধ্যেই একটা জোঁক আমার গায়ে পড়েছে। নরেশকে লবণের কৌটটা পকেট থেকে বের করতে বললাম, নরেশ কিছুটা নুন ছড়িয়ে দিল। জোঁকটি গা থেকে পড়ে গেল। ক্লান্ত শরীরে অবকাশ পথে আবার শুরু হল পথ চলা। পা উঠতে চায় না তবু যে যেতে হবে...। সন্ধ্যায় ফিরে এলাম তাবুতে। সকালের রান্না করা খিচুরি খেয়ে কিছুটা শান্তি পেলাম মনে। রাত্রির জন্য রান্না চড়াতে হবে। ঠিক হয় কে কোন দ্বায়িত্ব নেবে। কেউ নিয়েছে রান্নার কাজ, কেউ কুটনো কোটা, কেউ জল আনার আর কেউ রান্নার কাজ। আমি প্রকৃত পক্ষে একটু অলস স্বভাবের তাই আমার কোনটিরই দ্বায়িত্ব নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আর সত্যি বলতে আমি এমনিতেও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে আমরা কয়েকজন ইয়ংস্টার ছেলে-মেয়ে জ্বালানির দ্বায়িত্ব নিলাম। বেরিয়ে পড়লাম জ্বালানির সন্ধানে। গাঢ় অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে বিভিন্ন পাখি, পোকামাকড়, বাঁদর ইত্যাদি জীব জন্তু ডাকতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে যেন একটা ভৌতিক পরিবেশ। খুব ভয় করছিল সাপ এবং চিতার- তখন শুধু একে অপরে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করতে লাগলাম। একটি পাথরের চাঁয়ের উপর পা দিয়ে যেই গাছের শুকনো ডাল ভাঙতে গেছি সেই পাথরের খন্ডটি সরে গিয়েছে, আমি আছড়ে পড়লাম পাথরের উপর এবং অন্ধকারের মধ্যে একটি গন্ধ জাতীয় গাছের ডাল ধরে উঠে পড়লাম। তা নাহলে ৫১২০ মিটার উঁচু থেকে পড়ে আমি এতক্ষণ................। আরও অন্ধকার হয়ে এল ইতিমধ্যে আমরা কিছু কাঠ সংগ্রহ করেছি। কিন্তু পড়লাম এক মহাবিপদে, বন থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছিনা। যেদিকে যাচ্ছি সেখানেই গভীর অরণ্য। দেবারণ তো কেঁদেই ফেলল, আমি সাহস নিয়ে বললাম একটা উপায় তো বের করতেই হবে। ধীমান এবং ক্রিস্টিনা বলল- ওই দেখ জঙ্গলের গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে আলোর কিরণ দেখা যাচ্ছে। সায়ন বলল চল গিয়ে দেখি। চলতে শুরু করলাম আলোর দিকে, গিয়ে দেখি কয়েকটি চিড়িয়া হাউস। আর তার উপর কিছু লোক বাস করে। সমস্যা হল আমরা বাংলা ভাষী লোক হিন্দি তেমন জানিনা তাহলে কিভাবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো আমাদের সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে। সেই মূহুর্তে ভাবলাম- ধ্যান, উপাসনা, তপস্যা ইত্যাদির থেকেও ভাষা শেখা দরকার। কারণ ভাষা হল একে অপরের বন্ধুত্ব ও ভাব বিনিময়ে সাহায্য করে। ধীমান বলল সিনেমা দেখে কিছুটা বলতে শিখেছি, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। ধীমান বলল 'ঘর ম্যা হ্যায় কোন?' উত্তর এল এক বুড়ি ও তার মেয়ের। তারা বাড়ির বাইরে এল ধীমান বলল আমরা পথ হারিয়েছি দয়া করে যদি একটু সাহায্য করেন। বুড়ি বলল ঠিক আছে, সঙ্গে

ডেকে নিল তাঁর কুকুরটিকে। বেশ একটু সাহস এল, চলতে চলতে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে গল্প জুড়ে দিলাম। চলতে চলতে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে উন্মত্ত হয়ে উঠল। আমি চমকে উঠলাম, লাইট জ্বেলে (টর্চ) দেখলাম কুকুরটি একটি সাপ মেরেছে। আমি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং ভাবলাম কুকুরটিকে রক্ষীদূত করে পাঠিয়েছে আমাদের রক্ষা করার জন্য। দেখলাম কুকুরটি এক পায়ে খোড়া তাই তার তেমন কদর ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাঠি নিয়ে পৌঁছালাম গন্তব্যস্থলে। রান্নার কাজ শুরু হল। কিছুক্ষণ পর খাবার তৈরি হয়ে এল। খেতে শুরু করলাম, এত খাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল বকাসুর। আঃ! শান্তি, এই দৈত্যের মতো খাবার প্রথম খেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম কুকুরটি খিদেয় কাতরাচ্ছে। কুকুরটিকে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছিল এবং বুড়িকে তাবুতে আশ্রয় দিলাম। রাত্রিতে তাবুর মধ্যে ঢুকে গেলাম। সারারাত ঘুমোতে পারি নি, উত্তরের হওয়া দুঃস্বপ্নের মতো তেড়ে আসছিল। সকাল হয়ে এলে দেখি কুকুরটি তাবুর কাছে বসে আছে, ভাবলাম যাক মুসৌরির এই সৌন্দর্য ভরা প্রকৃতিতে কোন দারোয়ানের প্রয়োজন হয় না। কারণ এখানে প্রকৃতিই সব। (আমি আমার কলেজের ইয়ংস্টার সহপাঠীদের জানাচ্ছি যদি পারো একবার ট্রেকিং করতে যেও) কুকুরটিকে দেখে বললাম কিরে আজ ট্রেকিং করতে বেড়োবি আমার সাথে? ও আমার গা চেটে দেয়। ট্রেকিং এ বেড়িয়ে পরলাম কয়েক বোতল জল নিয়ে। এমনিতেই অনেক গুলি মোটা পোষাক গায়ে চাপানো আর জলের বোতল মিলিয়ে দ্বিগুণ হয়েগেছে। হাঁটা বেজায় মুশকিল তাই একটা মতলব আঁটলাম, একটা গাছের ছাল দিয়ে কুকুরটির গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। কুকুর বন্ধুটি হাঁটতে পারছে না। ওকে দেখে মনে হল মানুষ কি স্বার্থপর! তারপর জলের বোতল গুলি খুলে নিজে বহন করলাম।

পরের দিন সকালে আমরা মুসৌরিকে বিদায় জানিয়ে কেদারনাথের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। কিন্তু আসার সময় আমার জীবন রক্ষক বন্ধুকে কোথাও দেখতে পায়নি। আমার হৃদয় ভরা ভালোবাসা ওই উপকারী বন্ধুর জন্য সবসময় থাকবে। বন্ধু তুমি ভালো থেকো।

# কঠোর আইন করে কী হবে?

কৃষ্ণকান্ত হালদার(শিক্ষাকর্মী)

দুস্কৃতিকারীরা সাধারণত চার রকম অপরাধ করে থাকে। (১) মারপিট বা খুন (২) টাকা পয়সা ও সম্পত্তি নিয়ে প্রতারণা (৩) নেশাগ্রস্থ হয়ে দুষ্কর্ম (৪) ধর্ষণ বা যৌন অপরাধ। এই সমস্ত খবর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়। এবং জনমত প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে ৯৯.৯ শতাংশ লোকের মতামত শুধু একটাই কঠোর আইন তৈরী করতে হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করতে হবে।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল কঠোর নিরাপত্তা মুলক আইন অবশ্যই গুরুত্বপুর্ণ। কিন্তু আইনই নিরাপত্তায় যথেষ্ঠ নয়। আমরা আমাদের ইতিহাসে থেকে জানতে পারি প্রাচীন ভারতের আইন বড়ই কঠোর ছিল। চুরি করা প্রমাণিত হলে চোরের হাত কেটে নেওয়া হত। খুন প্রমাণিত হলে ফাঁসী দেওয়া হত। মিথ্যা সাক্ষী প্রমাণিত হলে জিভ কেটে দেওয়া হত। সোনার বস্তু পরে থাকলেও জনগণ তা ভুলেও স্পর্শ করত না। ক্রমে ক্রমে আইনকে অনেক শিথিল করা হল। কারণ এই কলি যুগে পাপী এবং অপরাধীর সংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে ঠগ বাজেতে গাঁ উজার। আমার মনে হয় বর্তমান কালে যদি হাত কাটা, জিভ কাটার আইন থাকতো তাহলে কোটি কোটি লোকের হাত-জিভ কাটতে হবে। মৃত্যুদন্ডও দেশ থেকে উঠে গিয়েছে! বিশেষ করে মানবাধিকার কমিশনের প্রভাবে বর্তমান যুগে পাপের জন্য কঠোর আইন আর নেই বললেই চলে। এই ভাবে আইনকে শিথিল করার ফলে দুষ্ট মানুষের উৎপাত আরো বেড়ে গেল। বিভিন্ন পত্রিকা খুললেই আমরা শুধু ভয়ঙ্কর সব অপরাধের খবর দেখতে পাই। দুই বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করে খুন, পিতা নিজের কন্যাকে ধর্ষণ, বৃদ্ধা খুন, পিতা দ্বারা পুত্র অথবা পুত্র দ্বারা পিতার খুন, মাতৃহত্যা, নিজের ভ্রাতৃহত্যা, ভ্রুণহত্যা ইত্যাদি। আজকাল আরও একটি নতুন খবর প্রকাশিত হচ্ছে যে শিশু প্রসব বা নবাগত শিশুকে বিক্রি করে দেওয়া। এই তালিকার কোন শেষ নেই। কিন্তু একটি কথা আমাদের বিচার করার খুব প্রয়োজন এই সব অসামাজিক কাজকর্ম যারা করে তারা বেশিরভাগ অশিক্ষিত লোকজন, যাদের মধ্যে কোন মানবতা বোধ নেই। কিন্তু একজন সরকারী ডাক্তার যাকে আমরা সাধারণ মানুষ ভগবানের রূপ বলে থাকি তার হাতে আমাদের জীবন মরণ। তারা যদি টাকার লোভে এই সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে আমাদের এই দেশের অবস্থা কি হবে? আর একটি কথা এখানে বলার প্রয়োজন, উচ্চ শিক্ষার মান কি নিচে নেমে যাচ্ছে? উচ্চ শিক্ষা মানে কি বেশী করে টাকা রোজগার করা তা যেমন করে হোক না কেন? আমার মনে হয় উচ্চ শিক্ষা মানে উচ্চ মনের মানুষ। তার চরিত্র, তার সততা, তার আচার আচরণ, তার ব্যক্তিত্ব যেন সাধারণ মানুষের থেকে একটু আলাদা হয়। সবাই যেন তাকে শ্রদ্ধা করে। তাই আমাদের শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয় নিয়ে বিচার করবার খুব প্রয়োজন।

যে সমস্ত জনগণের আবদারে আইনকে ক্রমে ক্রমে শিথিল করা হল সেই সব জনগণের উত্তরসূরীরাই আবার আইনকে কঠোর করার দাবী তুলছে। যখন কোন মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় জনগণ তার ফাঁসীর দাবি করে। কোন নিরপোরাধ শিশুকে হত্যা করা হলে জনগণ অপরাধীর ফাঁসীর দাবি করে। আইনকে আরও কঠোর করবার জন্য আন্দোলন করে। কিছু রক্ষক যখন ভক্ষক হয় তখন আইন মানুষকে কতটুকু সুরক্ষাদান করতে পারে বেশীর ভাগ সময় তা দেখা যায়। টাকা যার আইন তার। টাকার লোভে উকিলরা প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হতে দেয় না, নিরপোরাধীর শাস্তি হয়ে যায়। আবার মনে করুন জমির বেদখল রোধ করার জন্য সেটেলমেন্ট বিভাগের অনেক আইন আছে। সেই আইন ঠিক মত কার্যকারী করার জন্যে শত শত কর্মচারী, উকিল, ব্যারিস্টার নিযুক্ত করা আছে। তারা সরকার থেকে বেতন নিচ্ছে আবার মানুষের কাছ থেকে ঘুষ ও নিচ্ছে। যারা আইন কে রক্ষা করবে তারাই ঘুষ নিয়ে আইন ভঙ্গের সুযোগ করে দিচ্ছে। আমাদের দেশের বেশীরভাগ সরকারী অফিসাররা যদি বেতন পায় ৫,০০০ টাকা তো ঘুষ খায় ২০,০০০ টাকা। আইন যত বেশী কঠোর হবে সেখানে ঘুষের মাত্রাও তত বেশী হবে। এটাই এখন আমাদের দেশের নিয়ম। কোন সরকারী অফিসে সাধারণ মানুষ সঠিক নিয়মে কোন কাজ করতে পারে না। ঘুরতে ঘুরতে সে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বাধ্য হয়ে সে অন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করে। তাই রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে যায় কারোর কিছু করার থাকে না। আর সরকারের পক্ষে নিরাপত্তা রক্ষী দিয়ে সর্বত্র নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের দ্বিতীয় কোন বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে যা আইনী নিরাপত্তা থেকেও প্রবল।

আমাদের ভারতবর্ষে কিছু এলাকা আছে যেখানে চোর সুযোগ পেলে গৃহস্থের ঘরের তালা ভেঙে সবকিছু চুরি করে নেয় আবার কিছু এলাকা আছে সারা রাত দরজা খুলে রেখে ঘুমালেও কিছু চুরি হয় না। শোনা যায় প্রাচীন ভারতে মানুষ এমনই সৎ ছিল যে ভুল করেও অন্যের দ্রব্য স্পর্শ করত না। একবার এক ব্যক্তি তার এক বিঘা জমি অন্য একজনকে বিক্রি করে দেয়, বিক্রি করার এক সপ্তাহ পরে ক্রেতা ওই জমিতে চাষ করতে গিয়ে স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই করা একটি সিন্দুক খুঁজে পান ক্রেতা তখন বিক্রেতাকে ডেকে নিয়ে আসেন ও সব স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু বিক্রেতা স্বর্ণমুদ্রা ভরা সিন্দুক নিয়ে যেতে রাজি হন না। তিনি বলেন এই জমি এখন আমি বিক্রি করে দিয়েছি তাই এই জমির উপর এখন আমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু ক্রেতা বলেন এ জমি আগে আপনার ছিল, হয়তো আপনার পূর্বপুরুষেরা এই সব স্বর্ণমুদ্রা মাটির নিচে পুঁতে রেখে ছিল সুতরাং এগুলি আপনার গ্রহণ করা উচিৎ। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজনেই এই স্বর্ণমুদ্রা ভরা সিন্দুক নিতে রাজি হন না তখন সম্রাট আলেকজান্ডার ও নাকি এই কলহের সমাধান করতে পারেননি। তাই তিনি ভারতবাসীদের মনে মনে প্রণাম করে ভারত থেকে বিদায় নিয়ে ছিলেন। এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় বিকল্প, তাই মনে হয় উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের ধর্ম এবং নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া খুব প্রয়োজন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজারা সৈন্য সামন্তদের ভরণ পোষণের জন্য যতটুকু অর্থ ব্যয় করতেন তারচেয়ে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করতেন মানুষকে বেদ, গীতা, ভগবতের আদর্শ নিয়ে শিক্ষার জন্য। আমার মনে হয় যতদিন মানুষ অন্তর থেকে ধর্ম ভীরু না হবে,

ঈশ্বরে ভীরু না হবে ততদিন মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ববোধ আসবে না। আমরা শত শত আইন গঠন করেও তাতে কোন লাভ হবে না। আমরা ঘরে বসে যতই বিশ্ব শান্তির জন্য কামনা করিনা কেন কোন লাভ হবে না। আমাদের সবাইকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক সঙ্গে এই পথে এগোতে হবে। সমাজে যতক্ষণ ধর্মের অভ্যুত্থান না হবে ততদিন শত শত আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন কোন লাভ হবে না।

তাই ভগবান শ্রী কৃষ্ণ গীতা উপদেশে অর্জুনকে বলেছেন,

" যদা যদা ই ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় ও দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থানার্থায় সম্ভাবনি যুগে যুগে।।

ভগবান অর্জুনকে বললেন, যখন ধর্মের হানি হয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়। তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ সাকার রূপে জনসমুক্ষে প্রকট হই। সাধুদের রক্ষার জন্য এবং পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

# নোটের জ্বালা

সোমনাথ প্রামাণিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (প্রথম বর্ষ)

রামতনু বাবু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন মানুষ। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে সুখী সংসার তাঁর। সম্পত্তি বলতে ছিল দুই বিঘা ধানের জমি এবং বসত বাড়ীটুকু। তবে তিনি মানুষ হিসাবে ছিলেন বড়ো কৃপণ প্রকৃতির। তাঁর বাড়ির পাশেই রয়েছে বাজার। তবে তিনি কখনো বাজার গেছেন কিনা তা সন্দেহের ব্যাপার। এই ভাবে তিনি বেশ কিছু টাকা পয়সা জমিয়েছেন। তবে রামতনু বাবু  টাকা পয়সাকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখতেন। তিনি খুচরো টাকা গুলোকে পাঁচশো-হাজার টাকার নোট করে রাখতেন যাতে সেগুলো খরচ না হয়। তিনি একবার এক ভুঁয়ো অর্থ লগ্নিসংস্থায় ৫, ০০০ টাকা রেখে ছিলেন. সেই টাকা তিনি আর ফেরৎ পাননি। এই ঘটনায় তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি ব্যাঙ্কে পর্যন্ত টাকা রাখেননি। তিনি মনে করতেন ব্যাঙ্কে টাকা রাখা মানে সেই টাকা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই সমস্ত টাকা তিনি নোট করে করে বাড়িতে রেখে দিতেন। এই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। একদিন তিনি হঠাৎ শোনেন সরকার নোটবন্দি করেছে অর্থাৎ ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল হয়ে গেছে। রামতনু বাবু সেই খবর শোনার পর থেকে সেই যে বিছানা নিয়েছেন আর ওঠেননি। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর বাড়িতে তিলে তিলে গচ্ছিত ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট গুলো ব্যাঙ্ক নিয়ে নেবে আর তিনি তা ফিরে পাবেন না। কিন্তু যখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তাঁকে বোঝালেন সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে নতুন নোট পাওয়া যাবে তখন তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন এবং বিছানা ছেড়ে উঠলেন। তবে তিনি মাঝে মাঝে রাতে সেই  ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোটের স্বপ্ন দেখতেন। একদিন ভোর রাতে স্বপ্ন দেখেন তাঁর বাড়ির কাছে ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট উড়ে বেড়াচ্ছে, তিনি ধরবার চেষ্টা করছেন অথচ তিনি ধরতে পারছেন না। এই ভাবে তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। টাকাগুলি তিনি হাতে ধরতে যাবেন এমন সময় তাঁর স্বপ্ন ভেঁঙে যায়, কারণ তাঁর স্ত্রী ডাকতে থাকেন। টাকা জমা দেওয়ার জন্য শেষ তারিখ আর দুদিন মাত্র। তাই সকাল সাতটার সময় ব্যাঙ্কে না দাঁড়ালে সেদিনও জমা দেওয়া যাবে না। রামতনু বাবু তড়িঘড়ি ঘুম থেকে উঠে বহুকৃষ্টে সঞ্চিত নোটগুলি নিয়ে ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হলেন। বহুকষ্ট করে সেই নোট তিনি ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। তখন তাঁর বুকের পাঁজর খানা যেন খুলে যাওয়ার উপক্রম হতে লাগলো। কারণ সমস্ত টাকা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। মনের দুঃখে তিনি তখন একটা বনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছেন হঠাৎ তার শরীর খারাপ মনে হতে লাগলো। একটা গাছের ছায়ায় তিনি বসলেন ও ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙার পর তিনি যা দেখলেন তাতে তার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে

গেল। তিনি একটা শক্ত কিছু মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন যেটা প্রাথমিক পটে তিনি দেখেননি। এখন ভালো করে সেটা দেখলেন, আর যা দেখলেন তা কাউকে বলার মতো নয়। একটা টাকার বস্তা তিনি মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। আসলে সেই টাকা কেউ হয়তো গাছ তলায় ফেলে দিয়ে গেছে। বহু কষ্ট করে তিনি সেই টাকা ভর্তি বস্তাটি নিয়ে উদ্বিগ্ন মনে বাড়ি ফিরলেন। বস্তা খুলে দেখলেন সবই ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট। তিনি তখন ভাবলেন ভগবান হয়তো তার মনের দুঃখ বুঝতে পেরে এই বস্তা ভর্তি নোট তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই টাকা নিয়ে তিনি কি করবেন সেই ভাবনায় সে রাত তার ঘুম হল না। টাকার কী জ্বালা! পরের দিনও তিনি কাউকে কিছুই বললেন না। ভাবলেন সেই টাকা দিয়ে তিনি জমি, বাড়ি, গাড়ি করবেন। এই ভাবে দু-এক দিন কেটে গেল বাড়ির কেউ জানে না। রামতনু বাবুও শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন, ভাবলেন সেই টাকাটাও তিনি ব্যাঙ্কে জমা দেবেন। ছেলে যখন সেই টাকার ঘটনা শুনলো তখন তার বাবাকে বলল টাকা জমা দেওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। রামতনু বাবু আবার সেই শোকে বিছানা নিলেন, কারণ তাঁর হাতে বহু টাকা থাকা সত্ত্বেও সেই টাকা তার নয়। এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত হয়ে গেলেন। এদিকে যেভাবেই হোক আয়কর দপ্তর খবর পেয়েছে রামতনু বাবুর বাড়িতে অনেক টাকা আছে। পুলিশসহ আয়কর দপ্তরের লোক তার বাড়িতে আসে এবং আয়ের সঙ্গে সংগতি বিহীন টাকা রাখার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করে। টাকার কী জ্বালা! রামতনু বাবুকে জেল থেকে ছাড়ানোর জন্য উকিল দরকার। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা থেকে সেই উকিলের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর যে দুই বিঘা জমি ছিল সেই জমি বিক্রি করে সেই টাকা খরচ করে রামতনু বাবুকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। এই সমস্ত ঘটনা শোনার পর তিনি উন্মাদ হয়ে যান এবং পাগলের মতো বলতে থাকেন তাঁর কাছে সিন্দুকে ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট আছে। রামতনু বাবুর স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। সত্যিই নোটের কী জ্বালা!

# ইতি গোমস্ হত্যা রহস্য

বনানী বিশ্বাস

বাংলা অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

সকাল থেকেই আবহাওয়াটা খারাপ। মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামছে। আজ অন্তরা সেনের শরীরটাও ভালো নেই আর মনটাও বিষন্ন। একটা জোড়ালো আঘাত পেয়েছেন তিনি। সকালে তারই একজন ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ তাঁদেরই কলেজের নিকটবর্তী একটি গাছের ডালে। লোকাল থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। এতক্ষণে হয়তো পুলিশ চলেও এসেছে। যে কলেজের কাছে মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে অন্তরা সেন সেই কলেজেরই বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা এবং মৃত মেয়েটিও ওই কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। অন্তরা সেন মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন। মেয়েটির নাম ইতি গোমস্, মেয়েটি অনাথ। ইতির এই পরিণতিটা অন্তরা সেন কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। এবং শেষ বারের মতো তাকে দেখার ইচ্ছেটা আর দমন করে রাখতে পারলেন না, রওনা দিলেন কলেজে।

তখন বেলা এগারোটা, পুলিশ মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার জিজ্ঞাসাবাদের পালা। ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলে জানা যায় ইতি মিশুকে প্রকৃতির মেয়ে ছিল না। তবে তার সহপাঠী তনয় দে নামে একটি ছেলের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। আর রঞ্জন নামে একটি ছেলে কয়েক মাস আগে ইতিকে খুব বিরক্ত করত। কিন্তু মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে ইতির সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। অনল বন্দোপাধ্যায়ের নামটা তখনও কেউ বলেনি। যদিও অনেকেই অনল আর ইতির সম্পর্কের কথাটা জানত। এর একটা কারণও রয়েছে। অনলের বাবা কৈলাশনাথ বন্দোপাধ্যায় একজন বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা। তাই কেউই কোনো অপ্রিয় সত্যি কথা বলে তাঁর কাছে খারাপ হতে চায় না। তবে এবার অনলের নামটা প্রকাশ্যে এল। এই প্রসঙ্গটা অন্তরা সেনই তুললেন। অন্তরা সেনের বক্তব্যে কোথাও যেন অনলের প্রতি একটা নিঃশব্দ অভিযোগ ছিল। তবে পুলিশের সন্দেহটা সকলের উপরই ছিল। তাছাড়া অনল, তনয় ও রঞ্জন কেউই আজ কলেজে আসেনি। এদের বাড়ি গিয়ে জানা যায় তিনজনই গতরাত্রি থেকে বাড়ি ফেরেনি। অনলের বাবা কৈলাশনাথ ও বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা জানান অনল প্রায়ই কাউকে না বলে বন্ধুদের সাথে উধাও হয়ে যায় আবার কিছুদিন পর ফিরে আসে। সুতরাং অনলের বিষয়ে এটা কোন নতুন কথা নয়। তনয়ের বাড়িতে তনয়ের দাদা-বৌদি ও বিধবা মা থাকেন। তনয়ের মা জানান তনয় তার দাদা-বৌদির অত্যাচারেই বাড়ি থেকে চলে গেছে। রঞ্জন মা বাবার একমাত্র সন্তান এবং একমাত্র অবলম্বন। রঞ্জনের বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত। টাকার অভাবে অপারেশন থেমে রয়েছে। রঞ্জনের মা ছেলের বিষয়ে কোন কিছুই বলতে পারলেন না। ফলে তিনজনের বাড়িতেই পুলিশের কড়া নজর রইল। তবে সন্দেহের তালিকা থেকে অন্তরা সেনও বাদ যাননি। স্বভাবে তিনি গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁর মনটা কোন তালাবন্ধ

সিন্দুকের থেকে কম নয়। কিন্তু ইতির কাছে এর চাবি ছিল না। অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা ইতির বিষয়ে কিছু না জানলেও অন্তরা সেন যে অনেক কিছু জানতেন তাতে সন্দেহ নেই।

এরপর কয়েক দিনের মধ্যেই পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট চলে আসে। সেখান থেকে জানা যায় ইতির মৃত্যু হয়েছিল রাত্রি বারোটা থেকে ভোর তিনটের মধ্যে। মৃত্যুর আগে সে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। ইতির পরিচিত কয়েক জনের সাথে কথা বলে জানা যায় ইতিকে তারা কখনো ঘুমের ওষুধ খেতে দেখেনি এছাড়া ইতির ঘরেও কোনো ঘুমের ওষুধ পাওয়া যায় নি। তবে এর বেশী আর এবিষয়ে কোনো প্রমাণ বা সূত্র পাওয়া যায়নি। ফলে যতই দিন যাচ্ছিল ইতি হত্যাকান্ড ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে অন্তরা সেন খোঁজ খবর নিয়ে যেতেন। এর মধ্যেই জানা যায় অনল বাড়ি ফিরেছে। পুলিশ তার সাথে কথা বলে জানতে পারে সে এবং তার কিছু বন্ধু মিলে দীঘাতে বেড়াতে গিয়েছিল হত্যাকান্ডের পরের দিন সকালে। আর আগের দিন রাত্রে সে তার একটি বন্ধুর বাড়িতে ছিল। তার বন্ধুটিও একই কথা জানায়। আর অনল এও বলে যে সে ইতির খুনের ব্যাপারে কিছুই জানেনা। এছাড়া ইতির ফোনে যে শেষ নম্বরটি থেকে ফোন এসেছিল রাত্রি ন'টার দিকে। সেটা একটা পি.সি.ও এর নম্বর ছিল। সেখানেও খোঁজ খবর নিয়ে কিছু জানা যায়নি। ইতি হত্যা রহস্য ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল।

মাস তিনেক পর হঠাৎ একদিন একটি সন্দেহজনক ভিক্ষুককে রঞ্জনের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে দেখা যায়। এটা জানতে পেরে পুলিশ আরও সতর্ক হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন ওই ভিক্ষুক রঞ্জনের বাড়ির দরজার সামনে একটি থলে রেখে সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পরে যায়। এবং তার ছদ্মবেশ খুলে দেওয়ার পর দেখা যায় ছেলেটি রঞ্জন। আর ওই থলের মধ্যে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল বাড়িতে দেবে বলে। রঞ্জনকে এই খুনের ব্যাপারে যথেষ্ট জেরা করা হয় তবুও সে মুখ খোলেনা। তবে যখন জানতে পারল তার বাবা অপারেশন টেবিলেই মারা গেছেন তখন আর রঞ্জন নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। সে জানায় ওই দিন রাত্রে সে-ই ইতিকে পি.সি.ও থেকে ফোন করে আর বলে অনলের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সে নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। এটা শুনে ইতি কোনো ভাবে হস্টেল থেকে বেড়িয়ে আসে আর রাস্তায় রঞ্জনকে দেখতে পায় এবং দুজনে একটি ট্যাক্সিতে ওঠে। রাস্তাতেই ইতিকে ঘুমের ওষুধ মিশ্রিত জল খাইয়ে দেয়। ফলে ইতি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পরে। এর প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর অনল আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে কলেজের কিছু পরিচিত লোককে যাদের অনল অনেক টাকা দিয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে নিরপরাধ ইতিকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। এই খুনে অনলের সাহায্য করার জন্য অনল তাকে তার বাবার অপারেশনের টাকা দিয়েছিল এবং কয়েক মাস অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। রঞ্জন নার্সিংহোমে টাকা জমা দিয়েই পালিয়ে যায়। রঞ্জনের বয়ানের ভিত্তিতে অনলকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেও শেষ পর্যন্ত সবকিছু স্বীকার করে। অনল জানায় ইতির সাথে তার কোন শত্রুতা ছিলনা, শত্রুতা ছিল ইতির মায়ের

সাথে। এরপর বাকি কথা অন্তরা সেন বলেন। কারণ অন্তরা সেনই ইতি গোমসে্র মা। তবে ইতির আরও একটি পরিচয় আছে সে কৈলাশনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অবৈধ সন্তান। অন্তরা সেন যখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তখন জানতে পারেন কৈলাশনাথ বিবাহিত এমনকি তার সন্তানও রয়েছে। কৈলাশনাথ, অন্তরা ও তার সন্তানকে অস্বীকার করতে চাননি। কিন্তু হঠাৎ একদিন অন্তরা সেন কাউকে কিছু না জানিয়ে শহর ছেড়ে অনেক দুরে চলে যান। যেখানে যান সেখানেও কিছু সুহৃদ মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এক বয়স্ক খ্রীস্টান দম্পতির বাড়িতে তিনি আশ্রয় পান। ইতি জন্মাবার কয়েক মাস পরেই তাকে ওই দম্পতি অর্থাৎ রিচার্ড গোমস্ ও মেরি গোমসে্র কাছে রেখে কোন এক দুঃসম্পর্কের বিধবা পিসির কাছে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেন, কারণ তিনি ইতিকে নিজের বিষয়ে জানতে দিতে চাননি। অন্যদিকে কৈলাশনাথের অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তার স্ত্রী চিত্রলেখা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তখন থেকেই অনল কৈলাশনাথের মায়ের আদরে বেড়ে ওঠে এবং ঠাকুমার কাছ থেকে মায়ের হত্যাকারিনীর সম্পর্কেও জানতে পারে।

এভাবে চলতে চলতে অন্তরা সেন উচ্চ শিক্ষিত হয়ে কলেজের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এবং চাকরি সূত্রে আবার ফিরে আসেন তার চেনা শহরে। এখানে এসে তার আলাপ হয় ইতি গোমসে্র সাথে। ইতির পরিচয় শুনে ইতিকে চিনতে পারেন। তার সঙ্গে পুনরায় পুরোনো প্রেম মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে কৈলাশনাথের মনে। আবার উভয়ের মধ্যে কথাবার্তাও শুরু হয়। একদিন কৈলাশনাথ ও অন্তরার ইতিকে নিয়ে বলা কথাবার্তা অনল শুনে ফেলে আর সেদিন থেকেই তার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে শুরু করে। কারণ সে তার মায়ের হত্যাকারিনীর সন্ধান পায়। আর তখনই সে এই খুনের পরিকল্পনা করতে থাকে। ইতির সাথে প্রেমের নাটকটাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুলিশ তাকে যখন এই ভাবে হত্যা করার কারণ জানতে চায় তখন সে জানায় যে সে চাইলে ইতিকে ঘুমের ওষুধ না দিয়েও মেরে ফেলতে পারত কিন্তু সেভাবে হত্যা করলে তার মনের জ্বালাটা মিটতো না। সে তার মা কেও একদিন এভাবে ঝুলতে দেখেছিল। সেদিন যে আগুনটা তার মনে জ্বলে উঠেছিল ইতির দেহকে ঝুলতে দেখে তার সেই আগুন শান্ত হয়। সে আরও জানায় যে এই অপরাধের জন্য সে অনুতপ্ত নয়। অনল, রঞ্জন সহ আরও যারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের সবার শাস্তি হবে এটা আশা করা যায়, কিন্তু ইতির মধ্যে যে পুরোনো সম্পর্কের নতুন সূচনার বীজ লুকিয়ে ছিল তা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। এর কয়েক মাসের মধ্যেই অন্তরা সেন অন্য কলেজে বদলি হয়ে যান। কৈলাশনাথও তাঁর আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে জীবনটা আর স্বাভাবিক হয়না। কিছুদিন পর তনয়ও ফিরে আসে। এখন প্রায়ই তাকে কলেজের নিকটবর্তী গাছটির নিচে বসে থাকতে দেখা যায়।

# গোপীনাথপুর কুলাই তলা মেলার বিষয়বস্তু

**পিযুস হালদার, প্রথম বর্ষ (ইতিহাস বিভাগ)**

ভূমিকা ঃ- গোপীনাথপুর কুলাই তলা মেলা যেটার বর্তমান অবস্থান গোপীনাথপুর ও রাধানগর এর মধ্যবর্তী স্থানে, বেশীর ভাগ গোপীনাথপুরের দিকে অবস্থিত। সেখানে বর্তমানে একটি প্রাইমারী ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত (যার নাম নেতাজী বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়)। একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র অবস্থিত। আগে যেখানে পুরো গ্রামটার অধিকাংশ জঙ্গলে ঢাকা নিম্নভূমি ছিল। এখন সেখানে দেখতে দেখতে গ্রামটা বেশ উন্নতির দিকে এগিয়েছে।

উৎপত্তি ঃ- গোপীনাথপুর কুলাই তলা মেলা, তৎকালীন সময়ে মেদিনীপুরের বাসিন্দা কাশিমা বেগম সাহেবা মোটামুটি ৪০০ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা করেন। আগে গোপীনাথপুরে একটি কাছারী ঘর ছিল যেখানে খাজনা আদায় করা হত। কাশিমা বেগম সাহেবা গোপীনাথপুরের জমিদার ছিলেন। ঠিক ৪০০ বছর আগে বৈশাখ মাসের হাল পূর্ণিমার দিনে কাছারী ঘরে এক বর্গী হাঙ্গামা হয়। হিসাব করে দেখা যায় ঐ দিন বর্গীরা বেগম সাহেবার কাছারী ঘর লুঠ করতে যাচ্ছিল। বর্গীরা প্রবেশ করেছিল রাধানগরের মধ্যে দিয়ে। কুলাই তলার কাছে একটি গাছ ছিল যেটা অন্যান্য গাছের তুলনায় বড়ো। আর সেই গাছে একটি ভীমরুলের চাক ছিল, সেখান দিয়ে বর্গীরা অর্থাৎ ডাকাতেরা আসতে গিয়ে ভীমরুলের চাক তাদেরকে আসতে দেয়নি। সেই দিন রাত্রে কাশিমা বেগম সাহেবাকে দেবী মা স্বপ্ন দেন আর এই ঘটনা বলেলেন, তারপর দেবী মা কাশিমা বেগম সাহেবাকে বলেন তোকে আমি রক্ষা করেছি তুই আমার পূজা দে। তখন বেগম সাহেবা কর্মচারীদের দ্বারা গোপীনাথপুর কুলাই তলাতে মঙ্গলবারের দিন পূজা ও মেলার আয়োজন করেন। সেই থেকে আজও এই পূজা হয়ে আসছে। তারপরে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর এখন গ্রামবাসীরা পূজা ও মেলার আয়োজন করে বৈশাখ মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ মঙ্গল্বারে। আরও দৃষ্টান্ত দেখা যায় ৬০-৬৫ বছর আগে। রাধানগর নিবাসী দরুজ সেখের কন্যার বালীতে বিবাহ হয়েছে। মেয়েটা বালী থেকে রাধানগরে আসছিল বৈশাখ মাসের অত্যন্ত গরমের দিনে। কুলাই গাছের তলাতে লাল পাড়ের শাড়ি পড়ে আলগা চুলে বসে আছে। মেয়েটি দেখে তার দিকে তাকাতেই মেয়েটিকে বলে 'আমাকে কি দেখছিস বাড়ি যা।' তখন মেয়েটি ঐ যে বসেছিল তাকে পাল্টা জবাব দেয় যে তুই কে যে বলছিস বাড়ি যা? এই কথা বলতে না বলতেই দেবী মা তার চোখ কানা করে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী যেতে গিয়ে তার কাকার সাথে দেখা হয় এবং তিনি তাকে বাড়ী নিয়ে যান। বাড়ী গিয়ে সবাইকে খুলে বলে ঘটনাটা। সেই রাত্রেই দরুজ সেখকে স্বপ্ন দেন যে মঙ্গলবারে বৈশাখ মাসে সেখানে যেন তার পূজা দেয়। সেই থেকে ওই পূজা আজও হয়ে থাকে। মেয়েটা আজও প্রত্যেক বছর বৈশাখ মাসে এসে পূজা দেয়।

বিষয়বস্তু ঃ- গোপীনাথপুর কুলাই তলা মেলার বিষয়বস্তু হল তৎকালীন সময় থেকে এই মেলা আজও হয়ে আসছে। সকলে মানে এই মেলাকে। হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই এই মেলাতে অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গার মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়।

মেলার গুরুত্ব ঃ- গোপীনাথপুর কুলাই তলা মেলার গুরুত্ব বলতে গেলে বেশ অনেক কিছুই বলতে হয়। এই মেলাতে নানা জায়গা থেকে মানুষজন এসে ভিড় জমায়। এখানে বিভিন্ন রকম দ্রব্যের দোকান বসে এবং সেখান থেকে অনেকটাই আয় হয় মনে করা হয়। মেলাতে একটি কমিটি গঠিত হয়। যেখানে মেলাতে কোনো হট্টগোল হয়না আর মেলাটিকে বিভিন্ন ভাবে কমিটি দেখাশোনা করে। এছাড়াও সামাজিক দিক থেকে বলা যায় যে সমাজে আর্থিক দিক থেকে বেশ উন্নতি হয়। কিছুটা অন্য জায়গাতে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে তার কারণ বিভিন্ন দোকান পাঠ বসেছিল তাদের বিভিন্ন বেচাকেনাতে বেশ লাভবান হয় ঐ ব্যবসায়ীরা। মোটের উপর বলা যায় ঐ দিনের প্রভাবে সমাজে বেশ উন্নতি ঘটে। অনেক কিছু দরকারী জিনিস যেগুলি মেলাতে পাওয়া যায়। এইভাবে স্থানটি অনেক আগে থেকেই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠে সামাজিক উন্নতি ঘটে আর্থিক দিক থেকে। এক কথায় বলতে কী ঐ দিন বেশ সকলে আনন্দে কাটায়, একসঙ্গে পুরোনো দিনের বন্ধুদের সাথে দেখা হয়। এমন কী প্রশাসন পর্যন্ত সেখানে পাহারায় থাকে। আমাদের তেহট্ট থানার পুলিশ বাহিনী।

ধর্মীয় স্থান ঃ- গোপীনাথপুর কুলাই তলা একটি গুরুত্ব পূর্ণ ধর্মীয় স্থান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। আসলে হিন্দুধর্মের লোকজনেরা প্রত্যেকে যথেষ্ট ভাবে মানে এই স্থানটিকে। এই স্থানটির কাছে একটি হাইস্কুল ও প্রাইমারী স্কুল আর তার সাথে আছে গোপীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন জায়গার মানুষের ভিড় হয় এবং সেখানে মেলাতে অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন। এখানে অবশ্য হিন্দুধর্মের প্রাধান্যতা বেশী এই কুলাই পূজার উপলক্ষ্যে। আগে এখানে শুধুমাত্র পূজাটা হত এবং বর্তমানে বেশ জাঁক-জঁমক ভাবে আয়োজন হয় মেলার।

উপসংহার ঃ- সব মিলিয়ে বলা যায় গোপীনাথপুর কুলাই তলা মেলার তাৎপর্য্য বেশ গুরুত্ব পূর্ণ। এখানে সব ধর্মের লোকেরা এই মেলাতে উপস্থিত থাকে। যখন মা কুলাই দেবীর পূজা হয় তখন বিভিন্ন জায়গার লোকজনেরা এই পূজাতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই মেলা থেকে যেমন সামাজিক মেলবন্ধন ঘটে এবং আর্থিক দিক থেকে বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ঐ দিন কিছুটা হলেও আয় হয় এই মেলার ব্যবসায়িকদের দ্বারা। প্রত্যেক বছর বৈশাখ মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ মঙ্গলবারে এই পূজা ও মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলা অনেক বছর প্রায় ৪০০ বছর নাগাদ হয়ে আসছে আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতে এই মেলা আরও উন্নতি সাধন করবে এবং মেলার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে, তার সাথে সমাজের বেশ কিছুটা উন্নতি সাধন হবে। এই সব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি গোপীনাথপুর পূর্বপাড়া নিবাসী সন্তোষ বিশ্বাসের কাছ থেকে। বর্তমানে তার বয়স ৮৪ বছর এবং আজ পর্যন্ত মানুষটি এখনো বেঁচে আছে।

# ত্রিহট্টের কৃষ্ণরায়

মৌমিতা বিশ্বাস

তেহট্ট গভর্নমেন্ট কলেজ

ইতিহাস সাম্মানিক বিভাগ(বি.এ প্রথম বর্ষ)

তেহট্ট ছিল অবিভক্ত বাগুয়ান পরগনার একটি প্রাচীন গ্রাম। তেহট্ট এখন মহকুমা। বাগোয়ান বাসী রামদেব ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ৮২৭ সালে) এখানে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তেহট্টের নাম ছিল ত্রিহট্ট। খানা ডোবায় ভরা জঙ্গলাকীর্ণ একটা গ্রাম। কৃষ্ণনগর- করিমপুর বাস পথে কৃষ্ণনগর থেকে ৪৩ কিমি উত্তরে তেহট্ট। একটা সময় ছিল যখন সপ্তাহে দুদিন করে এই অঞ্চলে তিনটি স্থানে হাট বসতো। বারবার জলঙ্গীর গতি পরিবর্তন জনিত কারণে জলঙ্গীর পূর্বপাড়ে এক প্রশস্থ স্থানে তিনটি হাট একত্রে বসতে শুরু করে। জনগণের কাছে স্থানটি ত্রিহট্ট নামে পরিচিত হয়। ত্রিহট্টের অপভ্রংশ হল তেহট্ট।

নদীয়া জেলায় জোড়বাংলা মন্দির দুটি। একটি বীরনগরে অপরটি তেহট্টে অবস্থিত। কৃষ্ণরায় বিগ্রহের জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে একটা পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠা লিপি আছে। তাতে সংস্কৃতে লেখা আছে—

১৬০০ শাকে শূন্যনভঃষড়িন্দুগনিতে মেষগতে ভাস্করে
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ নিরতঃ শ্রীরামদেব মহান
লক্ষ্মী যস্যপদারবিন্দসেবনবেধৌ ব্যাপার সম্পাদিনী
তস্য শ্রীপুরুষোত্তম চ গৃহং যত্নৈরকার্যীত স্বয়ং।।

বাংলা অনুবাদ করলে পাব ১৬০০ শকাব্দের (১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসে শ্রী গোবিন্দের পাদপদ্মসেবী মহান পুরুষ রামদেব, লক্ষ্মী দেবী যাঁর পদ সেবা করেন তাঁর উপাসনার জন্য, যত্নের সঙ্গে শ্রী পুরুষোত্তমের এ মন্দির নির্মান করেন। এখানে শূন্য ০, নভঃ ০, ষড় ৬ এবং ইন্দু ১ ধরে 'অঙ্কের বামগতি' নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠা কাল ১৬০০ শকাব্দ।

জোড়বাংলা মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। ইঁট দিয়ে তৈরী এই মন্দিরে সামনের দেওয়ালে ছিল টেরাকোটার কাজ। সেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং ত্রুটিপূর্ণ সংস্কারে পলেস্তারায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। পিছনের দোচালায় গর্ভগৃহে যাবার প্রবেশ পথের উপরে টেরাকোটার কাজ এখনও বর্তমান। দুটি চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ও দুটি রাজ কর্মচারী। খিলানের প্রান্তে সাতটি করে দুই সারিতে ১৪টি আটচালা শিবালয়। তাদের ঘিরে আছে ১২টি বাতিদান এবং ফুল পাতার অলংকরন এখনও পর্যন্ত বাঁচানো গেছে।

মন্দির নির্মান প্রতিষ্ঠা লিপি, রুদ্র রায়ের আমল, রামদেবের সাহায্য প্রার্থনা, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সাহায্য দানও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মন্দিরের ভগ্নদশা নিয়ে অনেক প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। ভক্তরাম বিশ্বাস ও নারায়ণ চন্দ্র দে এদের বই গুলিতে এই নিয়ে আলোচনা আছে। যদি সমাধানের চেষ্টা এইভাবে করা যায় কেমন হয়? শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রামদেব কিন্তু এই ইঁটের মন্দির নয় কারণ ইঁটের মন্দির পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভগ্নদশায় আসতে পারে না। দরিদ্র রামদেবের পক্ষে এই রকম জোড়বাংলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রামদেব বিধবা কন্যা লক্ষ্মী দেবীরপুরুষোত্তমের সেবা উপাসনার জন্যই মন্দিরটি নির্মান করেন। সাল তারিখের নিরিখে সেটা রুদ্র রায়ের আমল ছিল অবশ্যই। সুতরাং মন্দিরটির জন্ম লগ্নে কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে রামদেব মন্দিরের দুরাবস্তা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাটানোর জন্য নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থী হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তেহট্টের দেবালয় এবং বিগ্রহ সেবা ও পূজার্চনার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রী শ্রী পুরুষোত্তমের নিত্য পূজা সহ অন্যান্য ব্যয়ভার বহনের নিমিত্ত ৫০০ বিঘার 'ঠাকুর বাড়ী' মাহাল নামে জমি দান করেন। জমিদারী উচ্ছেদের সাথে সাথে সেই জমিও বেহাত হয়ে গিয়েছে। এখন মাত্র ৩১ শতক জমি মন্দিরের নামে আছে।

রামদেব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়ের বিগ্রহটি মুরলীধারী পুরুষোত্তম। বিগ্রহটি ছোট আনুমানিক ৮ ইঞ্চি, ওজন প্রায় ৭/৮ কেজি কালো কষ্ঠি পাথরের মূর্তি ছিল। আনুমানিক বাংলা ১৩২৯-৩০ সালে ঐ মূর্তি চুরি হয়ে যায়। গ্রেফতার হয় হাঁসপুকুরিয়ার পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা চাতর আলি। ১৩৩০ সালে মন্দিরটি বিগ্রহ শূন্য ছিল, কিন্তু নিত্য পূজা ও ভোগ রাগ চলত যথারীতি। ১৩৩১-৩২ এই দুই বছর নদীয়া রাজবাড়ীর বিগ্রহ এনে পূজা করা হত। বিগ্রহটি মন্দিরের সাথে মানান সই ছিল না। বাংলার ১৩৩৩ সালে (ইংরাজি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ) নদীয়ার রাজা ক্ষৌনিশ চন্দ্র কলকাতার চিৎপুর থেকে ২২৫ টাকায় বর্তমান বিগ্রহটি কিনে দেন। এই বিগ্রহ অষ্ট ধাতুর তৈরী। উচ্চতা দেড় ফুট, ওজন ১৭ কেজি রং কালো। রাধিকা বিহীন মুরলীধারী পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়। ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ঐ মূর্তি আবার চুরি হয়ে যায়। প্রশাসনের চেষ্টায় প্রায় মাস খানেক পর বিগ্রহটি উদ্ধার হয়। থানার কালী মন্দিরে বিগ্রহটি দিন সাতেক রাখা হয়। নদীয়া রাজ এস্টেটের তৎকালীন কর্নধার শ্রী সৌমীশ চন্দ্র রায় মহাশয় বিগ্রহটিকে আসল বিগ্রহ বলে সনাক্ত করেন।

কৃষ্ণরায়কে নিয়ে লোক কাহিনীর অন্ত নেই। বিধবা লক্ষ্মী দেবীর সন্তান লাভ, শস্য রক্ষা ও ফলন বৃদ্ধি, মন্দির তৈরীর কাজে বিগ্রহের হাত লাগানো, চাঁদের ঘাট থেকে মন্দির পর্যন্ত কলার কাঁদি বহন, কুমরোর গায়ে মন্দিরের টেরাকোটার দৃশ্য, বাংলা দেশের এক মুসলমানের পঙ্গু পা ভালো হওয়া, বালা বন্দক দেওয়া প্রভৃতি বহু ঘটনা কথা লোক মুখে প্রচলিত।

প্রতিবছর চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে বারোদোলের মেলা বসে। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণরায় বিগ্রহও রাজবাড়ীতে যেত। রাজবাড়ীতে বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা মন্দির কর্তৃপক্ষকেই

করতে হত। এর জন্য রাজপরিবার কোন অর্থবরাদ্দ করত না। মেলা প্রসঙ্গে প্রণামী বাবদ প্রাপ্ত অর্থও মন্দির কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হত না। এই নিয়ে রাজপরিবারের সাথে মনমালিন্য ঘটে এবং তেহট্ট বাসীরা কৃষ্ণরায় বিগ্রহ নিয়ে রাজবাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে বিগ্রহের স্বত্বাধিকার নিয়ে মামলা চলছে। মামলা নং—Titles suit No 271 of 1969 CR. 2261/86 dt- 26-08-1990

প্রতিবছর মাঘ মাস ব্যাপী জলঙ্গীর তীরে বিশাল মাঠে শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়ের মেলা বসত। মেলার মাঠ হারিয়ে গিয়েছে অফিস পাড়ার আড়ালে। সাহিত্যিক দীনেন্দ্র রায়ের রচনায় এই মেলার কথা পাই। এই মেলায় বিভিন্ন পেশার মানুষের জমায়েত ছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য যেমন পাওয়া যেত, তেমনি প্রসাধনদ্রব্য পাওয়া যেত। থাকত বিনোদনের ব্যবস্থা। বাউল, কবিগান, যাত্রা, পুতুল নাচ, ম্যাজিক, সার্কাস মেলাকে আকর্ষনীয় চেহারা দিত। দেহপোসারিণীরত্তা ভিড় করত এই মেলায়। ১৯৫২ সালে এই মেলা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৩ তে নতুন আঙ্গিকে বসানো হয়। পরপর তিন বছর চলার পর মেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য মেলাটির আর কৌলিন্য ফেরেনি। এই মেলা থেকে যে আয় হত তা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের হস্তগত হত।

শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় মন্দিরে নিত্য পূজা প্রচলিত। এছাড়া জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রা অত্যন্ত সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় হালদার পাড়ায় জলঙ্গীর তীরে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রায় বিগ্রহ নিয়ে তেহট্ট পরিক্রমা করে ভক্তপ্রাণ মানুষেরা। শ্রাবণে মন মাতানো ঝুলন যাত্রায় অংশ নেয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা। ভাদ্রমাসে নন্দোৎসব তালের বড়ার প্রসাদ বিতরন করা হয়। কার্তিকমাসে হয় অন্নকূট অনুষ্ঠান, অগ্রহায়নের রাসে বিগ্রহ নব সাজে সজ্জিত হয়। মাঘী পূর্ণিমায় তিনদিন ব্যাপী নামযজ্ঞ হয়। অসংখ্য মানুষ বসে পাত পেড়ে খিচুরী প্রসাদ খায়। ফাল্গুনের দোলযাত্রা তো আলাদা মাত্রা নিয়ে আসে।

বিংশ শতকের পাঁচের দশকে শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় মন্দির এমনি জড়াকীর্ণ হয়ে পরে যে সেখানে পূজার্চনা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। তখন নদীয়ার রাজা ক্ষৌনিশ চন্দ্র রায়ের ব্যবস্থাপনায় ও নির্দেশে বিগ্রহটি রাজবাড়ীতে রাখা হয়। ১৯৫৪ তে মন্দির সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। নদীয়া রাজ এই মন্দির কমিটিকে অনুমোদন দেন। এই কমিটির সভাপতি শ্রী দ্বিজপদ ঘোষ, সহসভাপতি শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন দত্ত, সম্পাদক শ্রী গোবিন্দ রায় আগরওয়ালা, কোষাধ্যক্ষ শ্রী কাশীরাম আগরওয়ালা। তাছাড়া সদস্য ছিলেন শ্রী গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, শ্রী বসন্ত কুমার রায়, শ্রী তড়িৎ কুমার দে, শ্রী অজিত মোহন মল্লিক, শ্রী নফর চন্দ্র হালদার, শ্রী নিরাপদ হালদার ও ম্যানেজার নদীয়া রাজ এস্টেট। রাজ মিস্ত্রি দুলাল চন্দ্র ভৌমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে মন্দির সংস্কার সুসম্পন্ন হয়। তারপর মহাসমারহে শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় বিগ্রহ তেহট্ট মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

গত তিন শতাব্দী ধরে বহু ঘটনাস্রোত মন্দিরকে কেন্দ্র করে বয়ে গেছে। এখন তা কিংবদন্তিতে পরিণত

হয়েছে। তা থেকে এখনো এতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যেতে পারে। শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় বিগ্রহ নিয়ে তেহট্টবাসী ও কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের মধ্যে যে আইনি বোঝাপড়া থাকুক না কেন এই বিগ্রহ তেহট্টবাসীর ভাবাবেগের সাথে এমনি বাঁধা পড়ছে যে তা ছিন্ন করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়।

ঃ তথ্যসূত্র ঃ

(১) নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি - মোহিত রায় - ১৯৭৫

(২) স্মৃতির আলোয় (মেহেরপুর থেকে তেহট্ট) - অজিত দাস - ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

(৩) বর্তমান আলোকে অতীতের কৃষ্ণরায় - ভক্তরাম বিশ্বাস - ২০০৪

(৪) শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়ের আলোকে তেহট্ট - নারায়ন চন্দ্র দে - ২০০৫

# কবিতা কার্নিভাল

একগুচ্ছ কবিতায় শিবশংকর পাল
প্রধান, বাংলা বিভাগ

## জিন্সবালিকা

জিন্সবালিকা আমিই তোমায় পার করাবো গ্রাম্য নদী
তোমায় আমি পরিয়ে দেবো সর্ষেখেতের অলখ ঝোলা
ন্যাকড়াবাজি করবো না আর জলের মধ্যে আগুনখেলা
শিকড়মূলে নিত্য নতুন পাই যদি তোর মারণ হদিশ

টিনটুয়েন্টির ঝরণাতলায় আকাশ শুদ্ধ ভিজবো বলে
খিল খুলেছি হৃদকপাটের আমায় এখন না বলিস না
মেঘের ভেতর মেঘ হয়েছি বজ্র বিদ্যুৎ ঝড়-ঝাপটা
শিমুল পলাশ ফাগুন দুপুর মাথার মধ্যে যাচ্ছে গলে

শাপ শাপান্ত রাস্তা জুড়ে অশথ বৃক্ষ বোধির আলো
জলের তেষ্টা নদীর বুকে নদীর এখন পথ ফুরালো
হিমশৈলের মগ্ন বিপুল গলছে এখন বুকের মাঝে
ধ্রুবের সাধন উত্তরে দিক জয়ধ্বনি সকল কাজে

আমি যখন ফুল তুলেছি জিন্সবালিকা তোরই জন্য
শুকতারাটি চোখ খুলেছে এই সকালও দারুন বন্য

## বিষ

আমি বিষ খাবো। এই নামে একটি কবিতা লিখলো
মেয়েটি। কলেজ দূরে চলে গেছে। রোদ্দুরের থাবা
থেকে রক্ত ঝরছে। বৃষ্টি উদাসীন। ষোলকলা পূর্ণ হলো।
মা রান্না করছে। উনোনে পুড়ছে খিদের ডেডবডি।
আজ এস এম এস এলো ভণিতার। মেয়েটি
লিখলো, খেলাঘর ভেঙে গেলে পড়ে থাকে বালি।
নদী তাকে বুকে টেনে নেয়। ওয়াশিংমেসিনে গিয়ে
মুছে যায় সঙ্গমের সব দাগ। বিষ খাওয়া গাছ এখন
আকাশে মাথা তুলে ফুলের তীব্র পরাগ ছড়াচ্ছে।

## বাজিগরের কোলাজ

ঘষা কাঁচ। পিছনের দিনকাল
ভুশুণ্ডি স্তাবক
গতজন্মের শিশ্নোদরে অকাতর
চারিদিকে সুলভ শৌচালয়
আমি ঠিক পেয়ে যাবো তেপান্তর

তুমি দেখলে ছুটে যাচ্ছে লোকাল ট্রেন
সে দেখল সেঁধিয়ে যাচ্ছে ভীড়
কে যেন দেখলেন ছুটে যাচ্ছে গতিকণা

অগত্যা কাঁচের ভেতর থেকে বেরিয়ে অন্ধ রোদ
জলপান করল
মাঠ পেরিয়ে গেল গোলপোস্টের শূন্যতা
অশৌচ কাটিয়ে একদিন
শাবক ভেঙে ফেলল সুলভ কমপ্লেক্সের খোলস

গভীর নলকূপের উৎসব
ভরে উঠল জনতা অপেরা
তখন জর্দাপানে ভাতঘুম উষ্ণতার বাজিগর।

# কবিতা কার্নিভাল

একগুচ্ছ কবিতায় শিবশংকর পাল
প্রধান, বাংলা বিভাগ

## চাবি

চাবি বাঁদিকে ঘুরিয়ে তালা থেকে বের করে নিলে
আমার কেন জানি মনে হয় পৃথিবীর সব বাতাস
ফোকটে নিলাম হয়ে গেল; এক বায়ুশূন্য খাঁচায়
ভরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো নামহীন নক্ষত্রের
দূরতম কিনারে। আলো নেই, পাখির গানের সুর
থেকে মুছে গেল ভোরের মূর্ছনা, নদীর জল
অগাধ পিপাসায় শুয়ে থাকে বালুকা শয়ানে একা
আকাশ শুশ্রূষা নিয়ে বাঁচে হাসপাতালের জলে

তালাচাবির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না
আমার কবিতা কোনোদিন চাবিসঙ্গ করেনি হে
পিতামহের মতো উপদেশ দিয়ে সে কেবল নব্য
প্রজন্মের সূত্রধার আর বালি ঘড়ির ধারদেনা শোধে
চাবি ডানদিকে ঘুরে গেলে মনে হয় আকাশ দু ফাঁক
আমি সেই ফাঁক গলে উড়ে যাই আদি নক্ষত্রমণ্ডলে

## একটি গল্পের খোঁজে

এখানে মাটি দিয়েছিল একলা গল্পটি

একটি মেয়েলি বিকেল
জানে না বর্ণ পরিচয়

আঁচ ছিল তাই দিয়ে চলে যেত
এলোমেলো ভাতকাপড়
সোহাগ ও সাপ

বিষ পার করতে করতে
ভরা বিকেলের শস্যও
ফতুর নিয়তি বলে কারা একটা বালাও পরিয়ে দিয়েছিল
বাঁচা মরা জানে না ও মেয়ে
রঙ দেয় বিকেলের পটে
রাতের চিতায় দিনকে চড়িয়ে দিয়ে
দাওয়ায় বসে গল্প শোনায়
অন্য এক অক্ষরমালার গল্প

## বিষকন্যা

সৌমি মাঝি
বাংলা বিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)

সেটাই রীতি, সেটাই রেওয়াজ
উনিশ শতকের কন্যা বলেই
বিষ গেলবার সুযোগ পেলাম।
বিষ কন্যার বিয়ের সময়
নীলকণ্ঠ পুরুষ পেলো
আজন্ম ভরা নীর বিশ্বাসে
একুশে নারী জন্ম 'নিলো।'
বিষ কন্যার ডানায় ছিল
সাতটি সুরের কল্পনা রঙ,
আগুন রোদে পুড়িয়ে ডানা
একুশে নারী সংসারে সঙ।
আগুন রোদে পা রাঙিয়ে
ও চোখের তারায় সূর্য নাচে,
আগুন ঝরা ওই চোখেতেই—
আকাশ কুসুম ভালোবাসে।
অত্যাচারী ডাইনি বলুক,
যতই সমাজ পুড়িয়ে মারুক,
অভাগিনী কলঙ্কিনী—
ফিরবে লোকের মুখে মুখে।
ভালোবাসার হার মানা হার
পরিয়ে নারী থাকবে সুখে।
বিষ কন্যার বিষের রঙে—
সবুজ তো নয় নীল'ই ভারী,
বিষ শতকের বিষ কন্যে
একুশ শতকের আমি নারী।

## নুন

সুপ্রতিম মুখার্জ্জী
বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ

তুমি দুধ খাচ্ছ না যে, বকা খাও কেমন মজা
আমি তো পেট ভরে খাই, দেখছ না কেমন তাজা
তুমি সেই সাত সকালে উঠে যাও স্কুল গাড়িতে
আমি রোজ মাজছি বাসন, উঠোনে কলতলাতে
তুমি ছোটো আঙ্গুল দিয়ে, ট্যাবের ওই গেমের মাঝে
আমি ছুটি উল্কা বেগে, ঘাস, মাঠ, মাটির ভাঁজে
তুমি আছ এসির ঘরে, ঘুমোলেও পায়ে স্নিকার
আমি ভিজি পুকুর জলে, সাঁতরে এপার ওপার
তুমি যাও সঙ্গে গাড়ি, পার্কে, মল টলেতে
আমি রোজ মাজছি বাসন, উঠোনে কলতলাতে
মাঝে মাঝে হয় সে ভালোই, বিরিয়ানি, চিকেন ভুনা
তুমি খাও বলেই জোটে, তোমারই পাতের কণা
বাবা রোজ রাত্রে ফেরে, চোখ লাল, পা টলমল
ঠান্ডা ভাতের মাঝে, নুনটাই শুধু সম্বল
দোষটা কেবল মায়ের? রোজ রাতে কেন মার খায়?
মেঝেতে কানটা গুঁজে, কোনোমতে আওয়াজ থামাই
সকালে আবার সবাই, ভুলে যাই কালকের গান
নুন আর ভাতের খোঁজে, হাসি মুখে বাঁচার স্লোগান
তুমি দুধ খাচ্ছ না তাই, বকা খাও কেমন মজা
ভাত থেকে নুন কেড়ো না, নুনটাই রাখছে তাজা।

# The Spring

Nilanjan Biswas

English (Hons.)

Slowly slowly fades away
The glamour of winter,
Slowly slowly come out
New leaves and flower.

The sky without a cloud
Is blue and clean,
The birds in the bushes,
Dancing in joy, sing.

Fragrance of flower in the wind
Coming from south-sea,
Cause the busy bees
To seek sweet honey

I love these all
Without more reasons,
It is the spring
The "Queen of Seasons".

# The Devotion

Somashree

My soul thrills when you come
Like a universe that has no ends
Every burden knocks the door to be free
The memories remind the presence of you
The air summons when the time to unite
I can feel the strength of mity
The frisson of feelings is the fultitment of joy
Your breathing feels me rigarous life.
The devotion of lone that never ends
will always fly upon the sky forever....

## তুমি চলে গেছো অনেক দূরে

অক্ষয় বিশ্বাস
সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ক্রমিক সংখ্যা-১১

'তোমার' স্মৃতি আঁকড়ে
আমি বেঁচে আছি।
তুমি চলে গেছো বহু দূরে
তিস্তা নদী পার হয়ে পাতাঝরা
গাছটির কাছে
কত স্মৃতি লুকিয়ে আছে।
গোলাপের কাঁটা বিঁধে আছে
আমার স্মৃতির পর্দায়।
আলোময় পৃথিবীতে আজ
আমি বড় একা!
রয়ে গেল মনে জীবনস্মৃতি
হবে না আর কোনদিন দেখা।
এক নিঝুম রাতের শেষে
ঘুম ভেঙে গেল এক সুরে।
আমি আছি পৃথিবীতে বেঁচে
তুমি চলে গেছো অনেক দূরে—

## আমার কলেজ

দীপা মিস্ত্রী
বি.এ. প্রথমবর্ষ (জেনারেল)

আমাদের কলেজ সেরার সেরা
চারিদিক প্রকৃতিতে ঘেরা।
সবুজ আর সবুজে ভরা মাঠ ঘাট
কলেজের পরিবেশে বিশুদ্ধ বাতাস।
এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে জলঙ্গী
ক্লাসে ক্লাসে হুল্লোর নিয়ে সাথী সঙ্গী।
ঠান্ডা শীতল পাগল হাওয়ায়,
জুড়িয়ে যায় মন প্রকৃতির নেশায়।
কলেজের ক্যান্টিনে আড্ডা আর গপ্পো
তার মাঝে পড়াশোনা করছি অল্প অল্প।
কলেজের শ্রদ্ধেয় স্যারেদের পেয়ে সাহায্য,
আমরা সবাই হবো পরীক্ষায় কৃতকার্য।
লেখাপড়া ও আনন্দে কাটছে মোদের ভালোয়
এই তো মোদের তেহট্ট মহাবিদ্যালয়।

## প্রকৃতির রূপ

মৌমিতা হালদার
বাংলা বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

অপরূপ এ পৃথিবীর কতটুকু চিনি
সুন্দর এ জীবনের কতটুকু জানি।
শুধু অনন্ত নীল মহাকাশে দেখি
ঘন সূর্যতারা দেয় উঁকি।
চারিদিকে অসীম সবুজ বন
ক্ষনে ক্ষনে শুনি পাখির কুজন।
হলুদ ক্ষেতে শস্য ভরা
স্তব্ধ বাতাসে দেয় সাড়া।
কখনও দিবসে সূর্যের হাসি
আবার কালো চোখ মেলে আসে নিশি।
কখনও গ্রীষ্ম কখনও শীত
কখনও আবার বর্ষা ধারা।
অপার পরিবর্তনশীল প্রকৃতির রীত
অপূর্ব এই বসুন্ধরা।

## আমার গ্রাম

অনিন্দিতা বিশ্বাস
ইতিহাস বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

গ্রামের নাম শিবপুর সেথায় আমার বাড়ি,
সেই গ্রামের বর্ণনা আমি অল্প কথায় সারি।
উত্তরদিকে জলঙ্গি নদী চলে এঁকে বেঁকে,
তিন দিকেতে চাষের ক্ষেত ফসল আছে ঢেকে।
জলে আছে নানান রকম নানান মাছের মেলা,
বাচ্চা ছেলেরা ছিপ নিয়ে করে শুধু খেলা।
গ্রামে আছে নানান জাতি নানান লোকের বাস,
সুখ-দুঃখ মিলে মিশে কাটাই বারোমাস।
বারো মাসে তেরো পার্বণ সদায় লেগে আছে,
সাঁই উৎসব, বাউল মেলা সেরা সবার কাছে।
চাকরি করেন গুটি কয়েক বাকি সবার চাষ,
গ্রামকে এত ভালোবেসেও মেটে নাকো আশ।
নদীর চাপে ভাঙছে দুপাড়, ভাঙছে বাড়ি দুরন্ত যে নদী,
এমনি ছিল স্রোত সে নিরবধি,
হঠাৎ কখন তারই বুকে জাগত নতুন চর,
তারই মধ্যে গড়ে উঠত মানুষ জনের ঘর।
এই ছিল তার ভাঙাগড়া, এই ছিল তার খেয়াল,
কখনো সে ভাঙছে স্বপ্ন, ভাঙছে স্মৃতির দেয়াল।।

## স্বপ্ন

কল্যান চন্দ্র পাল
বাংলা বিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)

কবিতা তুমি এসেছিলে প্রভাতে
রক্তিম এক গোলাপ লয়ে হাতে,
লাল পেড়ে শাড়ি আলতা রাঙা পায়ে
মাথায় ছিল ঘোমটা চাদর ছিল গায়ে।
হঠাৎ তখন অবাক হয়ে দেখি
পরির মতো সামনে আমার একি!
আলতো ছায়া কোমল গায়ের রঙ
দারুণ ছিল সেদিন চলার ঢং।
স্বপ্ন আমার ভেঙে ছিল যখন
বসে ছিলে আমার পাশে তখন
কাঁধের পাশে বেণী করে চুল
মাথায় গুঁজে দুটো রাঙা ফুল।
মিষ্টি করে আমায় দেখে হেসে
হাতে দিলে হাত একটু ভালোবেসে।
কতবার ভাবলাম উঠি উঠি
অলস নিদ্রা তখন নিয়েছে ছুটি
কবিতা, তুমি এসেছিলে প্রভাতে।

## বসন্তের রঙে

তিথি প্রামাণিক
ইংরাজি বিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)

বাগানে ফুটেছে নানান ফুল
নদীতে চড়ছে হংসকুল।
বসন্ত আজ সাজায় ভালো পলাশ শিমুল ফুলে
কোকিল কেমন গাইছে গান শাখায় দুলে দুলে।
লাল লাল কৃষ্ণচূড়া আজ রঙের খেলায় মেতেছে
ঘাসে ঘাসে কোন মোহিনী তার সোনার আঁচল পেতেছে।
উদাম হয়ে বেড়ায় ভ্রমর ভেসে দলে দলে
চেনা সবই নতুন লাগে কোন রঙের মন্ত্রবলে।

## ACADEMIC STAFFS

Principal/Officer-in-charge: Dr. Gobardhan Rano (M.Sc, B.Ed, PhD)

**Department of Bengali**

1. Dr. Sibsankar Pal (M.A., B.Ed, PhD), Head of the Department
2. Nitish Ghosh (M.A., B.Ed, PhD pursuing)

**Department of English**

1. Saswata Kusari (M.A., pursuing PhD), Head of the Department
2. Saidul Haque (M.A., PG Diploma in Digital Humanities, MPhil)

**Department of History**

1. Raghunath Roy (M.A., B.Ed, PhD pursuing), Head of the Department
2. Aritra Majumdar (M.A., MPhil pursuing)

**Department of Political Science**

1. Pritin Dutta (M.A., PhD pursuing), Head of the Department
2. Avijit Saha (M.A., MPhil, B.Ed)

**Department of Philosophy**

1. Liza Dutta (M.A., MPhil, PhD pursuing), Head of the Department
2. Md. Najir Hossain (M.A., B.Ed)

**Department of Mathematics**

1. Dr. Gobardhan Rano (M.Sc, B.Ed, PhD), Officer-in-Charge
2. Dr. Supratim Mukherjee (M.Sc, B.Ed, PhD), Head of the Department

**Department of Physics**

1. Dr. Swarup Ranjan Sahoo (M.Sc, PhD), Head of the Department
2. Dr. Jyotirmoy Maity (M.Sc, PhD)

**Department of Chemistry**

1. Dr. Sk Basiruddin (M.Sc, PhD)

**College Staffs**

1. Ashok Kr Mahanto (Head Clerk)
2. Ramprasad Dutta (Office Staff, Clerk)
3. Md. Rafi Ali (Data Entry Operator)
4. Krishna Kanti Haldar(Office Staff)
5. Sadhan Bairaga (Office Staff)
6. Sankar Kumar Biswas (Office Staff)
7. Dibakar Mondal (Office Staff)
8. Jamat Ali Shaikh (Office Staff)

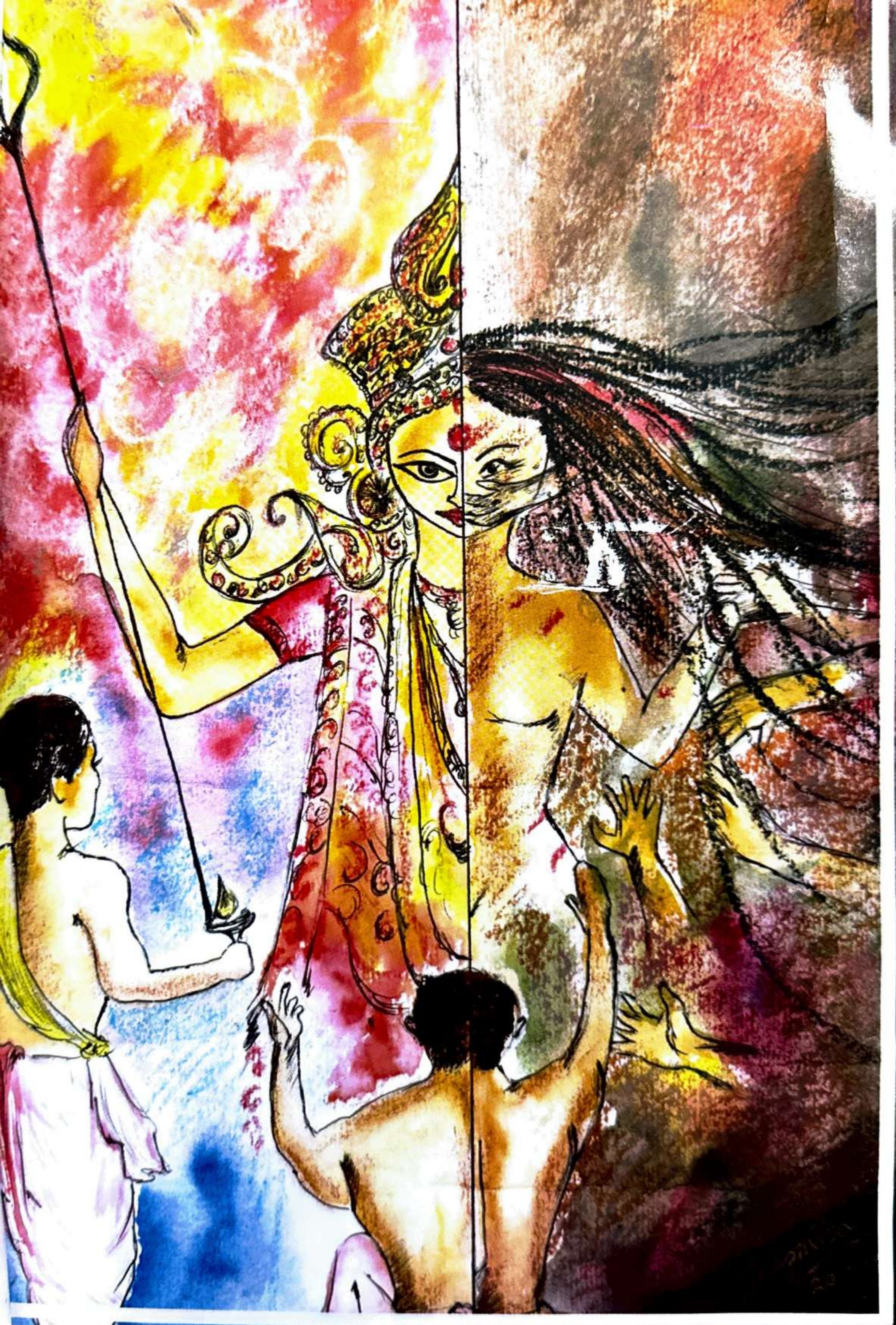

# তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

## তেহট্ট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১৬০

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ গোবর্দ্ধন রানো
কর্তৃক তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত
মুদ্রণে : আই সফট সলিউসন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া